অযান্ত্রিক

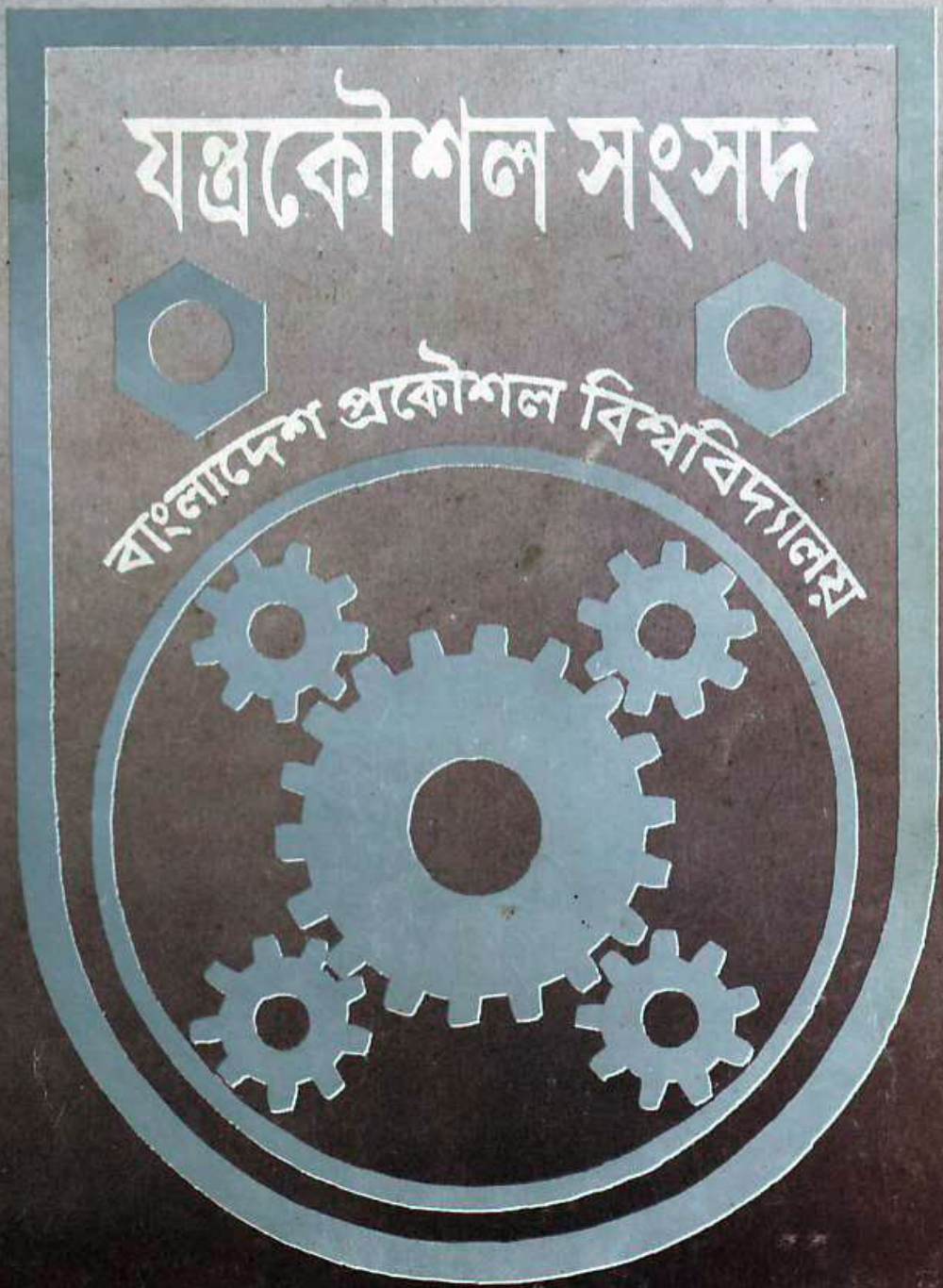

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে

মেকানিক্যাল ফেস্টিভেল '৯০ উপলক্ষে

যন্ত্রকৌশল সংসদের প্রকাশনা

অযান্ত্রিক

অযান্ত্রিক প্রকাশনা পরিষদ

সম্পাদকঃ– মোঃ ফররুখ শিয়ার পুলক

সম্পাদনা সদস্য – রণী, এহসান, সাগর,
হাশমতুজ্জামান

তত্ত্বাবধানেঃ– হাশমতুজ্জামান

সহযোগীতায়ঃ– আতিক, শাব্বির, মাহবুব,
জয়দীপ, আদম আলী

প্রচ্ছদঃ– মোঃ এহসান

নামকরণঃ– অভিক বড়ুয়া

ডিজাইনঃ– শামীম, পঞ্চম বর্ষ, স্থাপত্য

প্রকাশনাঃ– যন্ত্রকৌশল সংসদ,
যন্ত্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা

প্রকাশকালঃ অক্টোবর ১৯৯০

মুদ্রণে ঃ কনফিডেন্স কম্পিউটিং এন্ড প্রিন্টিং
বড় মগবাজার, ঢাকা।

প্রচ্ছদ ব্যাখ্যা

প্রচ্ছদে যন্ত্রকৌশল সংসদের মনোগ্রাম উপস্থাপিত হয়েছে। মনোগ্রামের মূল অংশে সন্নিবেশিত রয়েছে ৫টি গিয়ার। কেন্দ্রের বড় গিয়ারটি Driven gear আর সেটিকে ঘিরে রয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোট চারটি Driving gear. মাঝের বড় গিয়ারটি যন্ত্রকৌশল সংসদের প্রতীক আর চারটি Driving gear যন্ত্রকৌশল বিভাগের চারটি বর্ষের প্রতিনিধিত্ব করে। চারটি Driving gear যেমন কেন্দ্রের Driven gear –কে চালিত করে, তেমনি যন্ত্রকৌশল বিভাগের চারটি বর্ষের ছাত্র–শিক্ষকদের যৌথ প্রয়াসে যন্ত্রকৌশল সংসদের সব কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

মাননীয় উপাচার্যের বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, যন্ত্রকৌশল সংসদ প্রতিবারের মত যন্ত্রকৌশল বিভাগের বার্ষিক অনুষ্ঠান Mechanical Festival উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খেলাধুলার আয়োজন করতে যাচ্ছে। আমি আরো আনন্দিত যন্ত্রকৌশল সংসদ এ উপলক্ষ্যে প্রথম বারের মত একটি মনোজ্ঞ ম্যাগাজিন বের করতে যাচ্ছে। এই ম্যাগাজিনে ছাত্র–ছাত্রীদের মননশীল চিন্তাভাবনার কিছুটা প্রকাশ ঘটবে বলে আশা রাখি। আরো আনন্দের বিষয় যে, অনুষ্ঠানে ছাত্রদের নিজস্ব কারিগরী কাজের প্রদর্শনীর সংগে সংগে তাদের মননশীল কাজকর্ম যথা চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, আলোকচিত্র ইত্যাদির নিদর্শনও স্থান পাচ্ছে।

এ ধরণের আয়োজন ছাত্র–ছাত্রীদের মানসিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করার সাথে সাথে ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সহায়ক হবে। আমি অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর মোশার্রফ হোসেন খান
উপাচার্য
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সভাপতির বাণী

যন্ত্রকৌশল সংসদ যন্ত্রকৌশল বিভাগের শৈল্পিক কর্মকান্ডের প্রতীক। এই বিভাগের শিক্ষক এবং ছাত্র–ছাত্রীরা এই সংসদের মাধ্যমে প্রকাশ করে তাদের মনের ইচ্ছা ও গঠনমূলক চিন্তাধারা। বয়সে বাংলাদেশ দু–দশকে পড়লেও যান্ত্রিক গবেষণায় ও শিল্প উন্নয়নে একেবারেই শিশু। এহেন লগনে দেশ গড়ার কাজে যান্ত্রিক প্রকৌশলীদের ভূমিকা অপরিসীম। একজন সুস্থ, যোগ্য ও সামাজিক প্রকৌশলী গড়তে যন্ত্রকৌশল সংসদ বহু আগে থেকেই অবদান রেখে আসছে। ছাত্র–ছাত্রীদের শৈল্পিক সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড ও সামাজিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই সংসদের মাধ্যমে। এসব কর্মকান্ডের সমাহার এই বিভাগের ছাত্র–ছাত্রীদের সুন্দর, সুস্থ ও মননশীল প্রকৌশলী হিসাবে গড়ে তুলতে বিশেষ সহায়ক হবে। এই প্রক্রিয়া আরো সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য সকলের দৃষ্টি থাকবে এটাই আমার কামনা।

আজ যারা দেশ গড়ার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে সহায়তা করছে তাদেরকে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাই। অনুষ্ঠানটি সফল হোক এটাই আমার কামনা।

ডঃ এস, এম. নজরুর ইসলাম
সভাপতি, যন্ত্রকৌশল সংসদ,
প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান
যন্ত্রকৌশল বিভাগ
প্রকৌশলবিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের বাণী

যন্ত্রকৌশল বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত যন্ত্রকৌশল সংসদের নির্বাচন দীর্ঘদিন পরে এবারেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচিত সংসদ নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যন্ত্রকৌশল সংসদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উদযাপনের প্রাক্কালে এই স্মরণিকা প্রকাশ করা হলো। এই স্মরণিকা আগামী দিনের যন্ত্রকৌশল সংসদের কার্য্যক্রমকে ত্বরান্বিত করবে এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করবে, এ প্রত্যাশা সকলের।

যে সব ছাত্র ও শিক্ষকের কঠোর পরিশ্রমে এই প্রচেষ্টা সফল হলো – তাদের জন্য রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মোঃ মনিরুজ্জামান
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক
যন্ত্রকৌশল সংসদ ও
সহকারী অধ্যাপক
যন্ত্রকৌশলবিভাগ

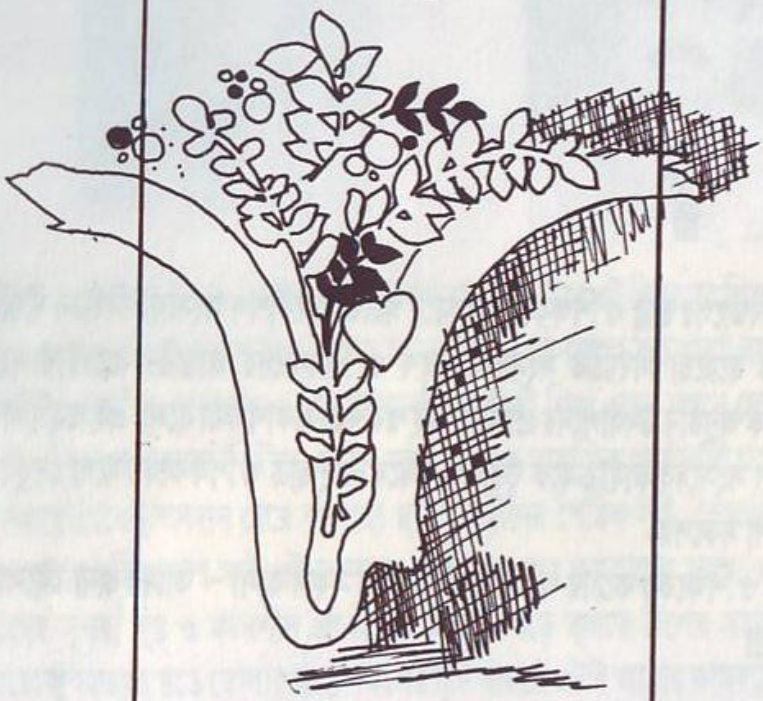

MECHANICAL FESTIVAL '90

এর অনুষ্ঠান সূচী

সময়ঃ

স্থানঃ বুয়েট অডিটোরিয়াম

৯·০০ প্রদর্শনী উদ্বোধন

৯·৩০ ভলিবল ফাইনাল
(শিক্ষক বনাম ছাত্র)

১০·৩০ আনন্দ ক্রীড়া ও পুরস্কার বিতরণী

১২·৩০ মধ্যাহ্ন ভোজন

২·০০ শর্ট ফিল্ম প্রদর্শনী

৪·০০ বিদায় সম্বর্ধনা

৬·৩০ আপ্যায়ন

৭·৩০ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৮·৩০ কনসার্ট

সম্পাদকীয়

অযান্ত্রিকের অগ্রযাত্রা সফল হউক ঃ

সব মানুষেরই মনের অলিন্দে শিল্প ও সাহিত্য চর্চার একটি ক্ষুদ্র আকাঙ্খা নিয়তই নিজের অজান্তে দোল খায়। মানুষের মানব হয়ে উঠার ভিত্তিমূলেই থাকে তার শিল্প ও সাহিত্য চর্চা। যন্ত্রকৌশল সংসদ এই চর্চার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই 'অযান্ত্রিক' বের করল। 'অযান্ত্রিক' অসীম সাগরের উদ্দেশ্যে ছোট্ট ভেলার মত তীর থেকে দূরু দূরু বুকে বহু আশা আকাংখা নিয়ে পাড়ি জমাল। এই ছোট্ট ভেলাকে পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর দায়িত্ব অনুজ ছাত্র বন্ধুদের। আমাদের অনুধাবন করা দরকার যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই মানুষ যান্ত্রিক হয়না বরং যন্ত্রের ধাতব শব্দে সানাই এর শব্দ খুঁজে পেলে জীবনের গূঢ় জটিলতাগুলোর রহস্য মিলে যেতে পারে। 'অযান্ত্রিক' যন্ত্রকৌশল বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের সাহিত্য চর্চার মুখপত্র হউক এই আশা রইল উত্তরসূরীদের প্রতি।

যন্ত্রকৌশলের মেয়েদের প্রতিঃ

বিংশ শতাব্দীর এই নারী প্রগতির যুগে আমাদের যন্ত্রকৌশলের মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হয়েও কতটা পিছিয়ে আছে তা যে কেউ এই পত্রিকা এক নজর দেখলেই বুঝতে পারবে। মেয়েদের থেকে কোন লেখাই আসেনি। সমীক্ষাতে মেয়েদের উত্তর এসেছিল অনেক কম। আমার বিশ্বাস আমাদের বিভাগের অনেক মেয়েই আছে যারা একটু সচেতন হলেই বিভিন্ন স্বাদের লেখা দিয়ে এই ম্যাগাজিনের কলেবর বৃদ্ধি করতে পারত অনেক গুণ। সম্ভবতঃ এই অসচেতনতার কারণেই কি আজ পর্যন্ত মেয়েদের হলের নামকরণ হয় নি নাকি বুঝতে পারি না। যাই হউক, মেয়েদের প্রতি আর্তি থাকবে, তারা যেন অদূর ভবিষ্যতে ছেলেদের পাশাপাশি তাদেরও লেখাগুলো দিয়ে ম্যাগাজিনগুলোকে সুশোভিত করে।

কবিতার আকালঃ

আমাদের দেশে কবির ছড়াছড়ি দেখে স্বনামধন্য কবি বলেছিলেন, 'যদি দু'টি ইট চোখ বন্ধ করে ছোড়া হয় তবে তার একটি গিয়ে লাগবে ঢাকা শহরের কাকের গায়ে আর অন্যটি লাগবে কবির মাথায়'। ভাবতেই অবাক লাগে এই দেশের মাটিতে জন্মেও এই যন্ত্রকৌশল বিভাগে কবিতার এত সংকট! এই কবিতার সংকট কাটানোর জন্য আমাদের বিভাগেরই এক ছাত্রের ভাগ্নের (৫ম শ্রেণীর ছাত্র) একটি কবিতা ছাপিয়ে দেয়া হ'ল। আশা এই, তাও যদি পরবর্তীতে কবিতার প্রতি একটু দৃষ্টি ফেরে।

অনুজ এবং বিদায়ী বন্ধুরাঃ

অনুজ এবং বিদায়ী বন্ধুদের ধন্যবাদ। তোমাদের লেখাতেই এই ছোট্ট ম্যাগাজিন মুখরিত। আর হয়ত এই চির পরিচিত ডিপার্টমেন্টে, সিড়ির ল্যান্ডিং এ,আলো ছায়া বারান্দায়, ক্লাশে, করিডোরে আমাদের দেখা হবে না। তবে পাখি উড়ে গেলেও তার ছায়া পড়ে থাকে কোমল মাটিতে, আমাদের এই দীর্ঘ চারটি বছরের অজস্র ঘটনার কোমল ছোঁয়া হৃদয় তো বয়ে বেড়াবেই। 'অযান্ত্রিক' যদি তোমাদের সকলের কাছে একটু হলেও ফেলে আসা সে সব দিনগুলির কথা, আমাদের প্রিয় সংসদের কথা মনে করিয়ে দেয়, মনে করিয়ে দেয় প্রতিবছরে অনুষ্ঠিত 'মেকানিক্যাল ফেস্টিভেল'-এর শিক্ষক ছাত্রের সম্মিলিত পদচারণার কথা তবে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমাদের আনন্দ দেবে।

মোঃ ফররুখ শিয়ার পুলক
সমাপনী বর্ষ

যন্ত্রকৌশল সংসদ '৯০—এর শ্রেণী প্রতিনিধিবৃন্দ

৪র্থ বর্ষ

ফেরদৌস কামাল

জাভেদ শামীম রণী

হাশমতুজ্জামান

মোঃ এহসান

৩য় বর্ষ

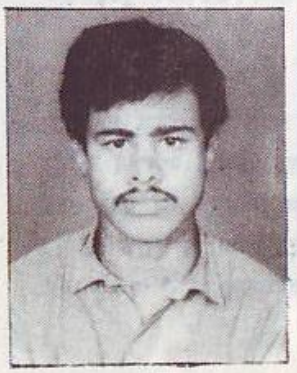

মোঃ তানজীলুর রহমান

মাহতাবুজ্জামান

মোঃ মনজুর-উল-আলম

মোঃ রহমত আলী

১ম বর্ষ	২য় বর্ষ (নতুন)	২য় বর্ষ (পুরাতন)
		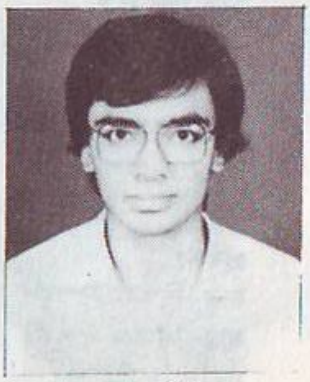
জয়দীপ গুহ	বিভাস সরকার	মোঃ হেলাল উদ্দিন
	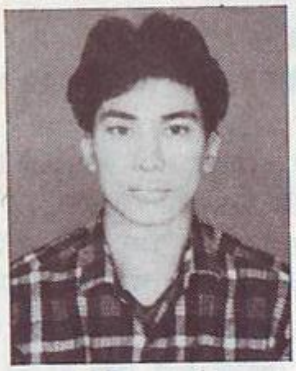	
এ, কে, ফয়জুল বারী	অভিজিৎ বড়ুয়া	
		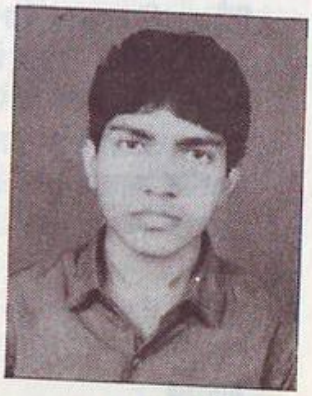
আখলাখ আহমেদ	মেহমুদ জগলুল করিম	মোঃ মনাওয়ারুল ইসলাম
	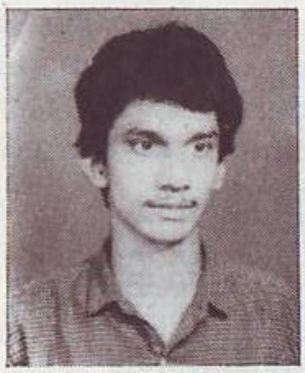	
মোরশেদ মামুন	নওশাদ চৌধুরী	মোঃ রাকিবুল ইসলাম

সূচীপত্রঃ

সাক্ষাৎকারঃ
একান্তে এক সন্ধ্যায়

প্রবন্ধঃ
ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কঃ (একজন শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে)
ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কঃ (এক জন ছাত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে)
যন্ত্র ও যান্ত্রিকতা
কেটে গেল ছ'টি বছরঃ
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিকাশ
ক্লাস ধর্মঘট ঃ রোধে তারে সাধ্য কার
তলাহীন কুয়ো
প্রকৌশল বাংলাদেশে

কবিতাঃ
বসন্ত এবং কবিতা
অলংকার
উত্তরসূরীদের জন্য
মিঠুর কবিতা
পদস্খলিত
ভন্ডামীটা রুখতে চাই
স্বাগতম
শতাব্দীর দাতা
কাব্যে আতংক

গল্পঃ
শূন্যদৃষ্টি
মানচিত্র

সমীক্ষা '৯০

একান্তে এক সন্ধ্যায়

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রকৌশলী এবং অধ্যাপক ডঃ মোঃ আনোয়ার হোসেনের সাক্ষাৎকারঃ

(সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ একজন স্বনামধন্য প্রকৌশলী এবং অধ্যাপক ডঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন ১৯৪১ সালের ৫ই জানুয়ারী পাবনা জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে আই, এস, সি তে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৬১ সালে তদানিন্তন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে যন্ত্রকৌশলে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এস, এবং ১৯৬৬ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ph.D ডিগ্রী লাভ করেন। বুয়েটে অবস্থানকালে তিনি আহসানউল্লাহ হলের প্রভোষ্ট, যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান এবং পরে উক্ত অনুষদের ডীন, সেন্টার ফর এনার্জি ষ্টাডিজের ডাইরেক্টর , বুয়েট এলামনি ফেডারেশনের জি,এস, 61 CLUB এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বিশ্ববিদ্যালয় সার্ভিস কমিটির জি, এস, শিক্ষক সমিতির জি, এস, ও পরে প্রেসিডেন্ট, ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালকসহ বিভিন্ন পদে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ICTVTR (বাংলাদেশ)–এর যন্ত্রকৌশল ও কেমিকৌশল বিভাগের প্রধান এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন, বাংলাদেশ (IEB)–এর প্রেসিডেন্ট। স্বনামধন্য এই প্রকৌশলী দেশ বিদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন WUS, NOAMI, WFEO, FEISCA, FEIIC ইত্যাদিতে দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মকান্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত WHOS WHO INTHE WORLD -এ তাঁর নাম মুদ্রায়িতহয়েছে।]

স্যার এর সাথে আগেই টেলিফোনে কথা বলে রেখেছিলাম। সন্ধ্যের কিছু পরেই আমি, আতিক, হাশমত উপস্থিত হলাম IEB তে। স্যার বাইরের একজন ডেলিগেটের সাথে কথা শেষ করে আমাদের সাথে যখন কথা বলতে বসলেন তখন রাত প্রায় আটটা। স্যারের রুমে তখন বেশ ব্যস্ততার চিহ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাশের টেবিলে কর্তব্যরত কর্তা ব্যক্তিরা প্রায়ই আসা যাওয়া করছেন। কেমন যেন মনটা হয়ে গেল। এসেছিলাম স্যার এর সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে। এখন হয়ত ফর্মালি কটা কথা বলে সরে

পড়তে হবে, তবুও হাল ছাড়লাম না। এত ব্যস্ততার মধ্যে থাকাতে স্যার বসতে বসতে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

আমরা কিছু বলার আগে স্যার সদ্য সমাপ্ত BUET DAY এর কথা বললেন। স্যার বললেন, অনুষ্ঠানটি কেমন যেন হয়ে গেল। স্যারকে BUET DAY এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাতে অনেক কথাই বললেন। যার সার কথা এমন 'বুয়েটের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন ক্লাবের সভাপতি, প্রবীন এলামনি, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানসহ একটা বড় ধরণের কমিটি করে অনুষ্ঠানটাকে ব্যাপক আকারে করলে আরও সুন্দর হত। প্রয়োজন বোধে এলামনিরা বুয়েটের জন্য ফান্ড সংগ্রহ করতে পারে, যা দিয়ে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু করা যেতে পারে, যেমন মেডিকেল সেন্টার ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিত্বের সাথে ছাত্র–ছাত্রীদের চিন্তা ভাবনার লেনদেনও কম মূল্যবান নয়। স্যার এই সময় বিশেষতঃ এলামনি ফেডারেশন এর কথা বলছিলেন। স্যার ব্যক্তিগত ভাবে এই ফেডারেশনের সাথে '৬১–'৭৪ পর্যন্ত অত্যান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এই ফেডারেশন এর উদ্যেগে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই বেশ ক'বার প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের Re-Union হয়েছিল। তখনকার এলামনি ঐ সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকান্ডে অনেক অবদান রেখেছিল। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠলে স্যার আলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। বিছুক্ষণ পর 'দুঃখিত' বলে উনি আবার আমাদের মাঝে ফিরে এলেন।

–স্যার, আপনি তো অনেক আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত, সেই আগেরকার সময়ের থেকে এখনকার সময়ের ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক কেমন? আমি বললাম।

–'এক কথায় বলতে গেলে খারাপ –স্যার বললেন। আমরা এই কথা শুনে একটু মন খারাপ করতেই স্যার পুনরায় বললেন –এটার জন্য অবশ্য ছাত্ররা একাকী দায়ী নয়, সামজ ও শিক্ষকদের এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। কেননা এক সময় তো এমন ছিল না। স্যার এ প্রসঙ্গে একটা ছোট ঘটনার কথা বললেন। সে সময় স্যার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা, একদিন মধ্যরাতে আমাদের হলের এক ছাত্র মেডিকেল হোষ্টেলে গেলে কি কারণে যেন তাকে মেডিকেলের ছেলেরা চরম মারধোর করে রুমে আটকিয়ে রাখে। এই খবর পেলে সব হলের প্রায় দেড় হাজার ছাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে মেডিকেল হোষ্টেলের মাত্র পাঁচশত ছেলেকে ঘেরাও করতে ছুটে। স্যারের কাছে খবরটা যাওয়ায় উনি তাড়াতাড়ি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং ছাত্রদের যেতে নিষেধ করেন, এসময় অনেক শিক্ষকও বাসা ছেড়ে যে যেমন আছেন লুঙ্গি, প্যান্ট পরা অবস্থাতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে এসে ছাত্রদের নিষেধ করেন। ছাত্ররা স্যারদের কথা শুনে আর যায় নি। স্যার বললেন সেদিনকার ছাত্রদের বিশাল মিছিল শিক্ষকদের একটি কথাতেই থেমে যায়। এই ঘটনা এটাই প্রমাণ করে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক তখন ছিল অত্যন্ত মধুর কিন্তু এখন অনেক কথা শুনি যা থেকে মনে হয় এই সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। ইতিমধ্যে একজন ভদ্র লোক এসে স্যার কিছু কাগজপত্র দেখালেন। ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত পোনে নয়টা। রুমের দিকে তাকালাম। রুমের ভিতরের ব্যস্ততা অনেকাংশে কমে গেছে। রাত বেশী হওয়াতে অনেকেই বাসায় চলে গেছে। একান্ত পরিবেশেটা ফিরে আসতে লাগল। মনটা বেশ ভাল লাগল। স্যারেরও সম্ভবত এই অনুভবটা ছুঁয়ে গেল। আবার আমাদের দিকে হাসিমুখে তাকাতেই বললাম–

–স্যার, ছেলেরা এখন একদমই ক্লাশ করতে চায় না। একটু ছুতো পেলেই ক্লাশ বর্জন, এর কারণ কি স্যার?

–'ফ্রাসট্রেশন' একটা বড় কারণ, চাকুরির অনিশ্চয়তা, তারপর রাজনৈতিক অস্থিরতা এসব মিলেই এই প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। তারপর ক্লাশের অত্যধিক বোঝাও ছাত্রদের ক্লাশ না করার অন্যতম কারণ।

–কি করে এর সমাধান করা যায়?

–'ক্লাশের , বিশেষতঃ সেশনাল ক্লাশ গুলোকে অন্যভাবে সাজালে হয়তবা অধিকতর ফলপ্রসূ হত, যেমন চারটে সেশনাল থাকলে একটা ছাত্র এর দুটো সেশনালের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরী করল আর বাকী দুটোর শুধু ডাটা এবং ক্যালকুলেশন করে জমা দিল। বুয়েটে এমন কিছু সেশনাল আছে যাতে ক্লাশে বসে তিন পিরিয়োড শুধু অংক করতে হয়। এমন টাইপের সেশনাল বাদ দিয়ে একটা থিওরি ক্লাশ বাড়াতে পারে। এ ছাড়াও স্যার এ প্রসংগে একটা ভিন্নতর পদ্ধতির শিক্ষার কথা বললেন, এই পদ্ধতিতে ২য় বর্ষের পরে দু'ভাগ হয়ে পরের দু'বছর ২৫% ছাত্র গবেষণা মূলক পড়ালেখা করবে আর বাকী ৭৫% ছাত্র

ফিল্ডে কাজ করার উপযোগী বিশেষ কিছু সাবজেক্ট পড়বে, এতে দু'ধরনের ছাত্ররাই দেশের উপযোগী হয়ে বের হবে।

আবার স্যার আগের প্রসংগে ফিরে এসে বললেন "ক্লাশ ঠিকমত চলার ব্যাপারে ছাত্র ও শিক্ষকের উভয়েরই বিশেষ ভূমিকা আছে। আগে গেট আটকালে আমরা করাত দিয়ে গেটের লক কেটে ফেলতাম এবং ছাত্ররাও ক্লাশে এসে যোগ দিত। একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।"

এ সময় স্যারের স্ত্রী অফিসে ঢুকলেন, স্যার আমাদের সাথে ভাবীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্যারের সাথে ভাবীও আজ I.E.B তে এসেছিলেন, আমরা মেকানিক্যালের ছাত্র বলাতেই ভাবী হেসে বলে বসলো, 'মেকানিক্যালের তো একটা বড় দোষ আছে'

–কি দোষ? হাশমত জিজ্ঞাসা করল।

উত্তরে ভাবী কিছু বলতে গেলে তখনই আতিকের হাতের কলম তৎপর হয়ে ওঠে, এটা দেখে ভাবী চুপ মেরে গেলেন। বললেন,–আপনারা খাতা কলম নিয়ে এসেছেন তাই বলব না? ভাবীর কথায় সবাই মিলে হাসলাম। এতক্ষণের আলোচনার ক্লান্তিটা ভাবীর উপস্থিতিতে হারিয়ে গেল। মনটা আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

–'স্যার, I.C.T.V.T.R এ কেমন আছেন?

–ভাল, বিভিন্ন দেশের ছাত্র, শিক্ষক, সব মিলিয়ে বেশ ভাল কটছে।

–'BUET এ আবার ফিরে আসবেন?'

–'আমি যদি মনে করি তেমন অবস্থান, যে অবস্থানে গেলে. আমি সকলের জন্য কিছু করতে পারব, তাহলে ফিরে আসব।' প্রায় দশটা বাজতে চলেছে। স্যার প্রায় দুই ঘন্টা ধরে আমাদের সাথে কথা বলছেন। এসময় ভাবীকেই জিজ্ঞাসা করলাম।

–'ভাবী, স্যার অবসরে কি করেন?'

–'তোমাদের স্যার তো অবসরই পাননা, তবে উনি একজন ফুটবল খেলোয়াড় আগ থেকেই। অবসর সময়ে খেলার খবর দেখেন।

এ সময় স্যার মুচকি হেসে বললেন 'খেলা নিয়ে আমার এক মজার ঘটনা আছে।' স্যার একবার পাবনার বেড়া গ্রামে খেলতে যান। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত মাঠে খেলতে নেমে নাকি তিন দিন খেলেও কোন পক্ষই গোল দিতে পারেনি। ঐ তৃতীয় দিনের রাত্রিতে স্যার এর খবর আসে উনি এইচ, এস, সিতে প্রথম হয়েছেন। আশপাশে খবরটা রটে যাওয়ায় সবাই স্যারকে দলে দলে দেখতে এসেছিল এই বলে যে, 'যে ফুটবল খেলে সে আবার বোর্ডফার্স্ট হয় কিভাবে?' স্যার বললো 'এটা আমার জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা।' প্রসঙ্গতঃ স্যারকে জিজ্ঞাসা করাতে স্যার জানালেন লিনেকার স্যারের প্রিয় খেলোয়াড়।

সবশেষে স্যারকে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে বের হওয়ার পথে আমাদের অর্থাৎ যন্ত্রকৌশলের বিদায়ী ছাত্র–ছাত্রীদের প্রতি একটি আশার বাণী দিতে বললাম–

স্যার বললেন, "মানুষ আশরাফুল মখলুকাত। ধৈর্য্য, আন্তরিকতা ও সততার সাথে কাজ করলে তাদের সফলতা আসবেই। আমি অত্যন্ত আশাবাদী।"

আমরা উঠে আসলাম। স্যার এবং ভাবীও উঠে দাঁড়ালেন। সদা হাস্যোজ্জ্বল ভাবী আমাদের একদিন বাসায় আসতে বললেন। চলে আসার সময় টের পেলাম এতক্ষণ যা আলাপ হয়েছে তা অফিসের ব্যস্ততা ডিঙিয়ে নিজেদের অজান্তেই একান্ত আপনার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সোডিয়াম লাইটের নিষ্প্রভ আলোয় ম্লান রাস্তাগুলো সারাদিনের ব্যস্ততা ঝেড়ে একটু বিশ্রাম নিতে শুরু করেছে। আরেকবার ঘড়ি দেখলাম। পুরাপুরি রাত দশটা। আমি, আতিক, হাশমত ধীরে ধীরে I.E.B থেকে শূন্য রাস্তায় নেমে এলাম।

[সাক্ষাতকার নেনঃ সমাপনী বর্ষের
–আতিক
–হাশমত
এবং পুলক (আমি)

ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কঃ

একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে

যন্ত্রকৌশল সংসদ আয়োজন করতে যাচ্ছে MECHANICAL FESTIVAL. প্রকৌশল শিক্ষার পাশাপাশি মুক্ত চিন্তা, সংস্কৃতি চর্চা, সংগীত, কিছুটা আমোদ–প্রমোদ, অনেকেরই স্মৃতিচারণার বিষয় হিসাবে থাকবে। এই উপলক্ষে আমার প্রিয় ছাত্ররা আমাকে বাছাই করে লিখতে বলেছে ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের উপর। এ বিষয়ে লেখার আমার উপযুক্ততা আছে কিনা জানিনা। কারণ আমি শিক্ষকতা চাকুরিতে নবীনদের কাছাকাছি, যদিও যন্ত্রকৌশলে স্নাতক পাশ করার পরে দীর্ঘ পনর বছর সরকারী দপ্তরে, শিল্পাঙ্গনে কাটিয়েছি। ঐ পরিবেশ আর এই পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন, নিজের জবাব দিহির সাথে সাথে চালাতে হয়েছে সহস্রাধিক শ্রমিক কর্মচারীর শাসন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত। অনেকক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় কারিগর, সেখানে মাঝে মাঝে শিক্ষকের ভূমিকায়, মাঝে মাঝে অভিভাবকের ভূমিকায়, মাঝে মাঝে সমাজের একজন হয়ে কাজ করতে হয়েছে। ঐ কর্মকান্ড চালাতে গিয়ে ১৯৭০ এ পাঠ করা শিল্প ব্যবস্থাপনার উদাহরণ বিহীন ক্লাশগুলির কথা, তত্ত্বগুলির কথা মনে পড়েছে। সেখানে মনে পড়েছে ঐ বইগুলির যদি বাংলাদেশের বা উন্নয়নশীল দেশের শ্রমিক ব্যবস্থাপনার উদাহরণ আকারে লিখা হত তা হলে কতই না ভাল হত। যা হউক আলোচ্য লিখাটিতে আমার অনভিজ্ঞতা ও আস্থাগত কারণ বিবেচনা করে বাঙ্গালীর প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিতে চেষ্টা করেছি। যদিও রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালের মধ্যে এই সকল চিন্তা করেছেন। আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির যুগে তার সাথে সমাজের পরিবর্তনের মাঝে কথাগুলি হুবহু মিলে যায় বলে আমার ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা সমস্যা' (আষাঢ় ১৩১৩) প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ''ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘন্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারের মুখও চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার কলও তখন মুখ বন্ধ করেন। ছাত্ররা দুইচার পাতা কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে, তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপর মার্কা পড়িয়া যায়।

কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে ঠিক ফর্মা দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়। এক কলের সঙ্গে আর এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো একটা তফাত থাকেনা, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের অনেক তফাত। এমনকি, একই মানুষের একদিনের সঙ্গে আর এক দিনের ইতর–বিশেষ ঘটে।

তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারেনা। কল সম্মুখে উপস্থিত করে, কিন্তু দান করে না; তা তেল দিতে পারে, কিন্তু আলো জ্বালানোর সাধ্য তাহার নাই।

য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতর বাড়িয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যা লাভ করে, সে বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; যেখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে, সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানাভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে, লিখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজে কর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারা লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেশনের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র। এই জন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে। তাহা সমাজের মাটি হইতে রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।''

এই অবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থায় আজও প্রবাহমান। দেশের উৎপত্তি, দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি সকল কিছু বাদ দিয়ে শাহনামা ষ্টাইলের স্বাধীনতার ইতিহাস আজকের প্রজন্মের মাঝে অতীত সম্বন্ধে কি ধারণা দিতে পারে। শিক্ষক এই ক্ষেত্রে ছাত্রকে কিছু বললে, ছাত্র কিভাবে গ্রহণ করবে, তার ধারণা থাকবে শিক্ষক যা বলছে তাত তার নিজের জাতির নয়। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আবালবৃদ্ধ জনতা সহ সর্বস্তরের মানুষ ইস্পাত কঠিন দৃঢ় ঐক্য নিয়ে হানাদার ও দেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছে সেখানে ইস্কুলের পাঠ্য বইয়ে দুই–তিনজন সিপাহীদের বীর কথা অনাগতদেরকে কিইবা দিতে পারবে। এক সময় শিক্ষার জন্য গুরু গৃহ ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে

গুরুগৃহের স্থান ছিল তপোবনে, সেখানে গুরু শিষ্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গ্রাম বাংলায় এখনো বহু পুরানো কথা চালু রয়েছে, এই ক্ষেত্রে সেই সময়ের আশ্রমগুলিতে যারা বাস করত তারা গৃহী ছিল এবং শিষ্যগণ সন্তানের মত গুরুদের সেবা করতেন। এইভাবটা গ্রাম বাংলার টোলে আজও স্থান পাচ্ছে।

এক সময় ছিল ছাত্রগণ অপরাধ করলে প্রায়শ্চিত্ত পালন করবে। শাস্তি পরের নিকট হতে অপরাধের প্রতিফল ও প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন, দন্ড স্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করলে গ্লানি মোচন হয়না, এ শিক্ষা বাল্যকাল হতে চলে আসা উচিৎ। রবীন্দ্রনাথ ছাত্র–শাসনতন্ত্র প্রবন্ধ, যা সবুজ পত্রে চৈত্র ১৩২২ (১৯১৬) সালে ছাপা হয়েছিল। তাতে লিখেছিলেন–

''ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে, ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের তান কোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশ বেদণা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাহাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই। তাহাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যাঞ্জনা। সে জন্যই সৎ গুরু উহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহবান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্য্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে উর্ধ্বের দিকে উৎঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুন রেখার মত অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়েনা, যারা নিজের বিদ্যাপদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত, তারা গুরু পদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না। কাজেই ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্য তারাই রাজদরবারে কড়া আইন ও চাপরাশ ওয়ালা পেয়াদার দরকার করিয়া থাকে।

ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা–পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কতো বড় ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন। পৃথিবীতে অল্প লোকই আছে নিজের অন্তরের মহৎ আদর্শ যাহাদিগকে সৎপথে আহবান করিয়া লাইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে ঘাত–প্রতিঘাতের ঠেলাতেই তারা কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া থাকে। বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে বলিয়াই তাঁরা আত্ম বিস্মৃত হইতে পারেনা।

এইজন্যই চারিদিকে যেখানে দাসত্ব মনিবের সেখানে দুর্গতি, শুদ্র যেখানে শুদ্র বাহ্মণের সেখানে অধঃপতন। কঠোর শাসনের চাপে ছাত্ররা যদি মানব স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়. সকল প্রকার অপমান দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতা যদি তারা নির্জীবভাবে নিঃশব্দে সহিয়া যায়, তবে অধিকাংশ অধ্যাপক দিগকেই তাহা অধঃগতির দিকে টানিয়া লইবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তারা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য কখনোই কেহ সাধন করিতে পারে না।

অপর পক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা খুশি তাই করিবে আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে? আমার কথা এই, ছেলেরা যা খুশি তাই কখনোই করিবেনা। তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাদের সঙ্গে ঠিক মত ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতা সত্ত্বেও তাদের স্বদেশীয় সংস্থাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেইঃ যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।"

আজকের কম্পিউটার, (ক্যাড, ক্যাম) রোবটিকস এর যুগে সভ্যতা অনেক এগিয়ে গেছে। শিক্ষার পরিধির অনেক ব্যপ্তি ঘটেছে। উন্নত বিশ্ব থেকে আমদানীকৃত নতুন নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সাথে দ্রুত পরিচিতি লাভ করে কিভাবে আমাদের মত করে ইন্টার ফেস ডেভেলোপ করা যায়। পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে আমরা স্বনির্ভর হতে পারব। জাতি এই আশাই করে। এই ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের ও শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। এই কর্তব্য সফলভাবে সমাধা করা গেলেই 'কল' প্রতিষ্ঠা সার্থক হবে। 'কল' চালাতে গিয়ে শিক্ষক ছাত্রকে আদর করবে, স্নেহ দিবে আর ছাত্র তার শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিয়ে শিক্ষককে পাশে টেনে রাখবে।

লিখেছেন–
মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক, আ, পি, ই, বিভাগ, বুয়েট

ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক

—একজন ছাত্রের দৃষ্টিকোন থেকে

প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত 'মেকানিক্যাল এসোসিয়েশন' আয়োজিত বাৎসরিক সভার একটি আলোচ্য বিষয় হল ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের চেয়ে আমাদের এখানেই এই বিষয়টি বেশী মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দেখা দেয়। প্রতিবারই আলোচনায় আলোচকগন কিভাবে এই সম্পর্কের হিম কঠিন বরফ গলানো যায় তা নিয়ে দিক নির্দেশনা এবং অঙ্গীকার দিয়ে থাকেন। হাততালি আর করমর্দনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটে একটি বরফগলা সকালে আগামীকাল আসুক সে প্রত্যাশা নিয়ে। তারপর 'পূনঃ মুষিক ভবঃ। এবার যন্ত্রকৌশল সংসদ কতৃক প্রকাশিত বার্ষিকীতে আলোচনার সেই পরিধি বলা থেকে লিখাতে এসেছে, এর গুরুত্ব অনুভব করেই। এ ব্যাপারে অনেকের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আছে, আছে গঠনমূলক মতামত। যা প্রকাশ করতে গিয়ে ক্যাফেতে চা'র টেবিলে ঝড় ওঠে। আমিও কখনও কখনও আলোচনায় যোগ দেই বা দেওয়া হয়ে যায়। কিন্তু সেটা লিখে প্রকাশ করাটা যে কত দুরুহ কাজ তা এ মুহর্তে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হলে আদর্শ হিসাবে অনেক উপমা এসে যাবে। কেউ বলবেন আরুনি আর তার গুরুর সম্পর্কের মত, যেখানে আরুনি গুরুর নির্দেশে জমির আইল বেঁধে পানি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে শরীর বিছিয়ে দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করেন। কেউ হয়তো বলবেন বাদশাহ্ আলমগীরের পুত্র এবং তার শিক্ষকের সম্পর্কের মত। কিন্তু এখন আরুনি আর জমিতে শুয়ে পড়ে না, শিক্ষকও তার খোঁজে বের হন না, বাদশাহ আলমগীরের মত কেউ ব্যথিত হন না। তবে কি এই যে সভ্যতার শিখরে আমরা দিন দিন আরোহন করছি বলে দাবী করছি সে সভ্যতার অবদান? আচ্ছা দেখা যাক আরুনিরা এখন কোথায় আর শিক্ষকরা তাদের কতটুকু খোঁজ নেন।

পূর্বে ছাত্ররা গুরুগৃহে থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করত। আমরা গুরু গৃহে না হলেও হল–অধ্যক্ষের গৃহে থেকে বিদ্যার্জন করি। আমাদের খুব কাছাকাছি ক্যাম্পাসেই থাকেন শিক্ষকরা। অতএব এটা ছাত্র শিক্ষক উত্তম সম্পর্ক থাকার একটা ভাল নিয়ামক হতে পারে। তদুপরি এখানকার শিক্ষকরা এখানেরই ছাত্র। অতএব মিউচুয়াল আন্ডারস্টেনডিং ভাল হওয়ার কথা, সম্পর্ক হওয়ার কথা উষ্ণ। কিন্তু বাস্তব যে ভিন্ন, তা না বললেও চলে। কারণ যারা শিক্ষক হবার প্রত্যাশী ছাত্র তাদেরকে অন্যান্য ছাত্রদের থেকে আলাদা গ্রুপে ফেলতে হয়। যেহেতু শিক্ষক হবার একমাত্র নর্ম মার্কস তাই তাদেরকে মার্কস ক্যারি করার কাজেই তৎপর হতে দেখা যায়। ছাত্র জীবনের অন্যান্য দিকের কথা তারা প্রায় ভুলেই যায়। 'যতক্ষন টিভি দেখবো, খেলা দেখবো, বন্ধু বান্ধবের সমস্যা আলোচনা করবো ততক্ষন দুটো অংক হয়ে যাবে' এটাই তাদের ধারনা। তাই তারা হয়ে থাকে ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং সাধারন ছাত্র সমাজ থেকে পৃথক। তার কাছ থেকে কর্ম জীবনে ছাত্ররা কি আশা করবে। ব্যতিক্রম সর্বত্র থাকে এখানেও আছে। ব্যতিক্রম আছে বলেই জীবনকে ফর্মুলায় বেঁধে রাখা যায় না, ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের স্ট্রাকচার নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পারমাণবিক বোমার আঘাত প্রাপ্ত হয়ে হিরোশিমার একমাত্র দালানটির মত। আসলে ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের যে দূরত্ব তা কোন সলিড নয় অনেকটা মানসিক। যে মানসিকতা আগামীর শিক্ষক ছাত্র অবস্থাতেই ধারন করে থাকে।

আমাদের শিক্ষকরা একদিকে শিক্ষক অন্যদিকে প্রকৌশলী। শিক্ষকতাকে তাঁরা শুধু ক্লাসের লেকচার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন, এটা অনেকেরই অভিযোগ। আর্থিক, পারিপার্শ্বিক দিক চিন্তা করলে তাঁদের এই অবস্থান স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক সময় তাঁদের অবস্থান বিতর্কের সূত্রপাত করে। একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের তাঁর বিষয়ে কেমন রেজাল্ট করল সে বিষয়ে খুব কৌতূহলী থাকেন। তাই পরীক্ষার খাতাটা খুব আগ্রহ করে দেখেন। ছেলেরা ভাল করলে তিনি গর্বে আনন্দিত হন। কিন্তু যখন পরীক্ষার তিন/চার মাস পরও মার্কস পাওয়া যায় না তখন কি ধারণা করতে হয়?

যেহেতু ছাত্রদের মধ্য থেকেই শিক্ষক নেওয়া হবে তাই শিক্ষকরা জহুরীর মত আসল সোনা বেছে নেবেন ছাত্র অবস্থাতেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কয়দিন পরে যে কলিগ হবে তাকে অনেক ক্লাস টিচারও

চেনেন না। ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের জন্য যদি শুধু শিক্ষকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয় তবে তা ভুল হবে। কারন উভয়ের আচার আচরণই ইন্টাররিলেটেড। কেউ ইন্ডিপেনডেন্ট নন। এই কারনেই ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায়। তবে যেহেতু ছাত্ররা পর্যায়ক্রমে আসে যায় কোন চিহ্ন না রেখে তাই সম্পর্কের ধারক হচ্ছেন শিক্ষকরাই। তাদের স্নেহ, আন্তরিকতাই সম্পর্কের প্রধান ফ্যাকটর হয়ে দাঁড়ায়।

ছাত্রদের মাঝে এমন অনেকেই আছে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছুতে স্কুল কলেজের শিক্ষকের অকৃপন সহযোগিতা পেয়েছে। এমনকি সেই সবের অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা পিতা মাতার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাবে তার সুকুমার গুণগুলি শুকিয়েযায়।

অটোক্রেটিক লীডারশিপ মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। যা ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য দেয় না তা আজকের দিনে অচল। তাই শিক্ষকগন যদি এমন মনোভাব পোষন করেন যে তিনি খেলার মাঠে হবেন ডেমোক্রেটিক, হল–প্রশাসনে হবেন অটোক্রেটিক তা আমাদের জন্য দুঃখকর। স্বৈর শাসনের নিস্পেষনে নিস্পেষিত ব্যক্তি বেপরোয়া হয়ে প্রতিবাদ করবেই তা ইতিহাস সাক্ষী দেয়। এবং স্বৈরতন্ত্র শুধু বিভেদই বাড়াবে ছাত্র–শিক্ষকের মাঝে, তা কোন সমস্যার সমাধান দেবে না। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গোলাম মহিউদ্দিন কতৃক রবীন্দ্রনাথের 'সবুজ পত্র ১৩২২' হইতে উদ্বৃত একটি বাক্য উচ্চারন না করে পারলাম না, 'ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তারা অধ্যাপকদের যে কত বড়ো ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন'।

শিক্ষকদের প্রতি অবিচল আস্থা এবং শ্রদ্ধা রেখে আমরা ছাত্ররা আশা করি যে স্যারদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা না পাই সামান্য সুপারিশের ব্যাপারে তারা পিছ পা হবেন না। কিন্তু হলিডে বলে স্যারের স্বাক্ষর পাব না অথচ যেখানে অন্য সব ডিপার্টমেন্টে স্বাক্ষর দেয়া হচ্ছে তা আমাদের অভিমানে আঘাত করতেই পারে। পূর্বেই বলেছি ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের ডিপার্টমেন্ট বেশি আলোচিত, সেদিন তা আবারও প্রমাণিত হল। প্রমাণ তো হবেই কারণ এখানে তো লজিক খাটানো যাবে না। "ডিপার্টমেন্ট কোনদিন পরাজয় স্বীকার করবে না। যদি কোনদিন তা হয় তবে তো সে দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলাপ্স করবে।"

মুজতবা আলী লিখেছেন, ''তাজমহলকে পাঁচগুন বড় করে দিলে লালিত্য সম্পূর্ন লোপ পেত, যদিও ঐ বিরাট বস্তু তখন আমাদের মনকে বিস্ময় বিমূঢ় করে দিত, আর আমরা স্তম্ভিত হয়ে বলতুম 'কি এলাহী ব্যাপার' ফলে শাহজাহান যে প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়ে ইমারত খানা তৈরী করেছিলেন তা ভুলে যেতুম।" আর তাজমহলকে ছোট করে দিলে কি হয়, তা তো স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শ্বেতপাথরের ক্ষুদে তাজমহল মেলা লোক ড্রইং রুমে সাজিয়ে রাখেন, পাঁচজন তার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই গৃহস্বামীকে জিজ্ঞেস করেন তিনি আগ্রায় গিয়েছিলেন কবে? ভদ্রলোকের আগ্রা গমন সফল হল– ক্ষুদে তাজমহল যে কোনে সেই কোনেই পড়ে রইল" (উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়– নির্বাসিতের আত্মকথা)

এ থেকে এ উপসংহার আমরা টানতে পারি ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক এমন হবে যেন শিক্ষকের মর্যাদা তাজমহলের লালিত্যের মত চির ভাস্বর থাকবে সাথে সাথে শিক্ষকদের গৌরব হবে ছাত্ররা।

–লিখেছেন
সমাপনী বর্ষের
বিদ্যুৎ আইচ

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এর বিকাশ

জয়দীপ গুহ
১ম বর্ষ, যন্ত্রকৌশল

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বৃহত্তর প্রকৌশল বিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা প্রধানতঃ ডিজাইন, মেনুফ্যাকচারিং, স্থাপনা, ইঞ্জিন, মেসিন ইত্যাদি প্রসেস– এর কার্যপ্রক্রিয়া নিয়ে চর্চা করে।

কাজকে সহজ করার মাধ্যমে প্রযুক্তির বিকাশ শুরু হলেও যন্ত্রকৌশল বিষয়ের পৃথক চর্চা প্রযুক্তিকে অনেক উন্নততর স্তরে এনেছে। যন্ত্রকৌশল চর্চার এই বিলম্বিত বিকাশের কারণ হলো, এখানে যে সকল বিষয়ের মৌলিক সূত্রগুলো ব্যবহৃত হয়েছে–যেমন, গতিবিদ্যা, কন্ট্রোল, তাপ–গতি বিদ্যা (Thermodynanics), এবং তাপ স্থানান্তর, ফ্লুইড মেকানিক্স, বস্তু শক্তি (Material Strength), বস্তু বিজ্ঞান, ট্রাইবোলজি (Tribology), অংকশাস্ত্র এবং কম্পিউটেশন–এবং অতিসাম্প্রতিককালে ইলেকট্রোনিক্স ও মাইক্রোপ্রোসেসিং–এসব বিষয় বিজ্ঞানে আপেক্ষিকভাবে সাম্প্রতিক কালের এবং এসকল বিষয় প্রযুক্তির এক উন্নত পর্যায় নির্দেশ করে। ধারাক্রমিকতায় প্রযুক্তির এই পর্যায়ের শুরুর সাথে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রসার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই যন্ত্রকৌশলের চর্চা এসব শিল্পের উন্নয়নের সাথে সমান্তরালভাবে সংঙ্গতিপূর্ণ। যন্ত্রকৌশল চর্চার সুতিকাগার বলা যেতে পারে বার্মিংহামের বোলটন্ (Boulton) ও ওয়াটের (Watt) সহো (Soho) ওয়ার্কসপ। এখানেই শুরু হয়েছিলো বৃহৎ শিল্প স্থাপনায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগের প্রচেষ্টা। উনবিংশ শতাব্দিতে এসকল প্রকৌশল কারখানাগুলো পরিপক্কতা অর্জনে সক্ষম হয় এবং শিল্প ও পরিবহনে (Industry and transport) দ্রুত তাদের প্রায়োগিক প্রভাব প্রসারিত করে।

প্রথমদিকে প্রকৌশল বলতে সামরিক প্রকৌশল ক্রিয়াকলাপকেই বুঝানো হতো। এবং বেসামরিক প্রকৌশল–যাকে পরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (পুরকৌশল) নাম দেয়া হয়েছিলো–তা স্বীকৃতি পেলো মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে। ১৮১৮ সালে প্রকৌশলীদের প্রথম পেশাগত প্রতিষ্ঠান ইন্সটিটিউট অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারস্ প্রতিষ্ঠিত হলো গ্রেট বৃটেনে– এর সভাপতি ছিলেন থমাস টেলফোর্ড (Thomas Telford)। ১৮৪৭ সালে রেলওয়ে প্রকৌশলীদের একটা দল অনুধাবন করলো যে ইন্সটিটিউট অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্সের সদস্যরা প্রকৌশলের নূতন ভাবনা– যা রেলওয়ের উন্নয়নের সাথে জন্ম নিচ্ছিলো– সে সম্পর্কে তেমন উৎসুক নয়। এ বিরোধীদলই সর্বপ্রথম তৈরী করে ফেললো যন্ত্র প্রকৌশলীদের পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ইন্সটিটিউট অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারস্–এই গ্রেট বৃটেনেই। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন জর্জ ষ্টিফেনসন (George Stephenson)। যন্ত্রকৌশল বিদ্যার এই পেশাভিত্তিক উন্নয়নে শুধুমাত্র যে লোম (Loms), লকোমোটিভ (Locomotives) এবং অন্যান্য হার্ডওয়ারই ধারাবাহিকভাবে উন্নত হতে থাকলো তা–ই নয় বরং এসকল মেসিন যেসব যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরী হতো তারও পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সাধিত হলো। লেদ মেসিন এক্ষেত্রে বৈপ্লবিক প্রায়োগিক তৎপরতা প্রদর্শন করলো। মেধার এই সমন্বিত অবস্থান শুধুমাত্র পুরাতন মেসিন থেকে বেশী দক্ষতা সম্পন্ন নূতন মেসিন তৈরীতেই সাহায্য করলো না–বরং নূতন মেসিন উদ্ভাবনেও অবদান রাখলো।

যদি শিল্প বিপ্লবের শুরুটা কোন বিশেষ দিনের সাথে স্থাপন করতে হয়– তবে খুবই সঙ্গত কারণে ১৭১২ সালের কোন একটি দিনকে বেছে নিতে হবে। এবছরই থমাস নিউকোমেন (Thomas Newcomen) সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক প্রায়োগিক বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তৈরী করেন খণি থেকে পানি উত্তোলনের জন্যে। জেমস্ওয়াট (James Watt) পরবর্তিতে এই বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন–এগুলোর থার্মোডায়নামিক্স ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে। অবশ্য তিনি প্রথম রোটেটিভ ইঞ্জিনও তৈরী করেন। এই ষ্টীম ইঞ্জিনেরই ভিন্নরূপ হাইপ্রেসার ষ্টীম ইঞ্জিন–১৮০২ সালে রিচার্ড ট্রেভিথিক (Richard Trevithick) তৈরী করেন–যা ১৮০৩ সালে প্রথম লকোমোটিভ তৈরীর রাস্তা সুগম করে দেয়। বস্তুতঃ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এভাবেই তার প্রাথমিক ধাপগুলো অতিক্রম করে।

উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি থেকে শিল্প ও যন্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্র সৃষ্টির একটি ঔৎসুক্য পরিলক্ষিত হয়। একদল যোগদেয় মটরযান তৈরীতে এবং একদল মনোনিবেশ করে কয়লাখণি, কাগজের কল, চিনি রিফাইনিং ইত্যাদি শিল্পে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতি নির্মাণে। বিশিষ্টতা অর্জনের এই কর্মোদ্যোম শুধুমাত্র গ্রেট বৃটেনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি–জার্মানীতেও এর প্রসার ছিলো লক্ষ্যণীয়।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং –এর বিকাশের পরবর্তী পর্যায়গুলো খুবই দ্রুত ঘটে গেছে। এখন কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে যন্ত্রের গতি, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ডিজাইন করতে। এসকল সাহায্যকারী যন্ত্রাদি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এর প্রায়োগিক দিকটার চেহারাই পাল্টিয়ে দিয়েছে বর্তমান কালে।

যন্ত্র এবং যান্ত্রিকতা

শ্যামল কুমার নাথ

৪র্থ বর্ষ, যন্ত্রকৌশল

যেখানে যন্ত্র, সেখানেই যান্ত্রিকতা–এমন একটা কথায় আমরা প্রায় সকলেই অভ্যস্থ। কথাটা কি আসলেই খাঁটি, একটু তলিয়ে দেখা যাক না। আসলে, যন্ত্র বলতে আমরা কি বুঝি। না, না, বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অথবা প্রকৌশলীদের মত করে সংজ্ঞায়িত করার ইচ্ছে আমার নেই। বরং একজন সাধারণ লোক যন্ত্র বলতে কি বুঝেন? যন্ত্র হচ্ছে এমন একটা কিছু যা কতকগুলি যুক্তি আর নিয়ম মেনে কাজ করে অবিরাম। যন্ত্র অবশ্যই কিছু কাজ করবে, মেনে চলবে যুক্তি আর বেঁধে দেয়া নিয়ম। নিয়মের বাইরে যাওয়া যন্ত্রের জন্য নিষিদ্ধ, যন্ত্র করতে পারে না অযৌক্তিক কিছুই, যেমন করতে পারে মানুষ, যন্ত্রের চালক। হ্যাঁ, যন্ত্রের আরো একটা বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে সবাই স্বীকার করবেন যে, যন্ত্র চলার জন্য অবশ্যই চায় একজন চালক। চালক ছাড়া যন্ত্র অচল।

যান্ত্রিকতার ধারণাটা তাহলে কি? যে কাজ একই নিয়মে চলছে অবিরাম, তাইতো যান্ত্রিক, বিশেষণরূপে ব্যবহার করলে দাঁড়ায় যান্ত্রিকতা। যান্ত্রিকতার এই ধারণাটাই আমরা সবাই–ই প্রায় ব্যবহার করি। কথা হচ্ছে এর থেকেই কি সেই সিদ্ধান্তে পৌছা যায়, যন্ত্র মানেই হছে যান্ত্রিকতা অথবা যন্ত্রের চালক অবশ্যই একজন যান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব। আমাদের দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ করা প্রয়োজন, প্রয়োজন দৃষ্টির গভীরে পৌছানো। মায়াময় চাঁদের আলো অদ্ভুত সুন্দর, তার থেকে চাঁদ কংকর আর প্রস্তরময় এক বিশাল ভূখন্ড এমন সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়। আবার এটাও ঠিক, যদি শুধুমাত্র চাঁদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েই মেতে যাই তাহলে তার স্বরূপ চিনে উঠবার কোন উপায় থাকে না। আসলে আমরা কয়লাকে ময়লা দেখেই ওটি ফিরিয়ে দিতে অভ্যস্থ অথবা ভরা হলুদের শর্ষে ক্ষেত দেখে বলে উঠতে অভ্যস্থ, বাহ্! – এর বেশী আর এগুতো চাই না।

বলছিলাম আর একটু গভীরে গিয়ে দেখবার কথা। এমন একটা কিছু কি খুঁজে পাওয়া যাবে, যা যন্ত্র অথচ তার বহিঃপ্রকাশ যান্ত্রিক নয়। আমরা সবাই অর্গানের সাথে পরিচিত। যদি অর্গানের বেলোতে পরিমিত বাতাস পরিবাহিত করে একটি রীড চেপে ধরা যায় অর্গান বেজে উঠবে, সেটাই অর্গানের কাজ। যদি অবিরাম বাতাস দেয়া যায় তবে ঐ অবস্থায় অর্গান বেজে চলবে অবিরাম। হ্যাঁ সহজেই সকলে বলবে, অর্গান যন্ত্র। তবে কি অর্গানের স্বরও যান্ত্রিক? যখন একজন অর্গান বাদক তার পরিশীলিত মনন থেকে একটি একটি করে গানকে বাতাসে ছড়িয়ে দেন সুরের মাধুর্য্যে, তখন কি একবারও বলতে ইচ্ছে হয়, একঘেঁয়ে, যান্ত্রিক! অর্গান কিন্তু তখনও তার সকল বাঁধা নিয়ম আর যুক্তির আবর্তেই বাজছে, যেমন করে কাজ করে একটি যন্ত্র। অথচ অর্গান এই সময় যান্ত্রিকতার উর্ধ্বে। অর্গান বাদক যান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট হন না, যন্ত্রের প্রাণে যান্ত্রিকতা থাকে না। অথচ এই যে আমাদের রসুলপুর গাঁয়ের সেই বটগাছের নীচেরকার কলিমউদ্দিন প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মুন্সীজি। মুন্সীজিতো নিজেই নিজের চালক।

প্রতিদিনের সূর্য উঠা আর অস্ত যাওয়ার মাঝে বদলে যাওয়া আবহাওয়া, পরিবেশ, নিয়ত তাকে পরিবর্তিত করে। প্রতিদিনের পরিবেশ তাকে নতুন কিছু না কিছু দিতে পারে যার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে তার চলন। তথাপি তিনি যখন ৩য় শ্রেনীর ইংরেজী ক্লাশে ঢুকে শুরু করেন 'সি এ টি ক্যাট—'। সেই তার প্রথম দিনের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের পর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত অবিরাম একই সুর একই ভাষা, একঘেঁয়েমী। তিনিতো যন্ত্র নন, তাঁর শ্রেণীকক্ষটি অথবা তাঁর ছাত্রছাত্রীরা, এদের কেউ কি যন্ত্র? না, এখানে যন্ত্রের সংস্পর্শও নেই, তবুও পুরো ব্যাপারটি যান্ত্রিক, নয় কি?

আসলেই যান্ত্রিকতা, যন্ত্রের দায় নয়। সেই প্রথম যেদিন চাকার আবিষ্কার হল, যদি সেদিনকে বলি যন্ত্র সভ্যতার শুরুর দিন, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যন্ত্র আমাদের এগিয়ে নিয়েছে অনেক অনেক দূর। এক একটি নতুন যন্ত্র, আমাদের গতিকেই দিয়েছে বাড়িয়ে, অথচ যান্ত্রিকতা হচ্ছে মূলত স্থবিরতা। আশ্চর্য, তার পরেওত যন্ত্রের পাশেই কেউ কেউ দাঁড় করাতে চান যান্ত্রিকতা। যন্ত্র কিন্তু তার সেই ধরাবাঁধা নিয়মে অবিরাম চলবার নীতিতেই চলে। স্থবিরতা আসে চালকে। অর্গান যিনি বাজান, যদি তার আংগুল মাত্র একটি রীডের উপরই বসে পড়ে শাশ্বত কালের জন্য, অর্গান যান্ত্রিক হয়ে যেতে বাধ্য। যান্ত্রিকতা কখনোই যন্ত্রের দায় নয়, দায় তার চালকের। গতি চাই চালকের মনে, তার জীবনে। যদি লেদের পেছনে কাজ করছে যে শ্রমিক তার জীবনে গতি না থাকে, যদি সেখানে প্রাণের স্ফূরণ দেখতে পাওয়া না যায়, যদি তিনি হয়ে পড়েন একঘেঁয়ে জীবনের ভাগীদার, তার চালানো লেদের যে সৃষ্টি সেটা যান্ত্রিক হতে বাধ্য। একই কথা প্রযোজ্য সেই মুন্সীজির বেলাতেও। যন্ত্রের পাশে না থেকেও যার জীবন প্রচন্ড রকমের যান্ত্রিকতা যুক্ত। যার কাজ, সৃষ্টি সবই পুরোপুরি যান্ত্রিক। যদি তার জীবনকে দেয়া যায় গতি, যদি তার চাহিদা বাড়ানো যায়, যদি তাকে অনুপ্রাণিত করা যায় তার কর্মক্ষেত্রে–যান্ত্রিকতা বিলুপ্ত হতে বাধ্য। 'সি এ টি ক্যাট' তখনই পাবে নতুন ছন্দ।

সভ্যতার শিখরে যত উঠতে চাই, তত চাই নতুন নতুন যন্ত্র। আর সে যন্ত্র চালানোর প্রথম যোগ্যতাই হচ্ছে, যান্ত্রিকতা কাটিয়ে উঠতে পারা।

কেটে গেল ছ'টি বছর

মোঃ ফররুখ শিয়ার পুলক
সমাপনী বর্ষ

'৮৬ এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী ক্লাশ শুরু হয়েছিল। '৯০ এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি দশটার সময় রুমে বসে আছি। হঠাৎ একটা মিছিলের শ্লোগান কানে এলো "চইল্লা গ্যালো চাইরটি বছর ঠাহর পাইলাম না" ক্যামন যেন, ব্যাঙ্গ মেশান করুণ সুর ভেসে আসে এই মিছিল থেকে। হঠাৎ বুঝতে পারলাম এই মিছিলতো আমাদেরই। রুম থেকে লুঙ্গি পরা অবস্থায়ই জামাটা নিয়ে দৌড়ে গেলাম মিছিলে। সে রাত্রিতে আমরা সব হলে মিছিল করলাম। সব হলেরই সমাপনী বর্ষের ছেলেরা আমাদের এ মিছিলে যোগ দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত বিরাটকায় একটা মিছিল হয়ে গেল। অনেকটা অঘোষিত সমাপনী র‍্যালীর আকারে ব্যানার বিহীন মিছিল নিয়ে সমস্ত ক্যাম্পাস ঘুরে শেষে ক্লান্ত হয়ে অনেক রাতে রুমে ফিরলাম। রুমমেটরা তখন ঘুমিয়ে গেছে। আশে পাশের রুমেও আলো নিভে গেছে। হাত পা ধুয়ে জামাটা খুলে রেখে রুম থেকে বের হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছাদে চলে আসলাম। আকাশে তখন একফালি চিকন চাঁদ। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর ব্যাপকতা তাই অনেক কম। মনেহলো ঐ চাঁদের অবস্থাটা ঠিক আমার মতই। শেষ প্রহরে এসে দাঁড়িয়েছি দু'জনেই। চাঁদটিকে তাই বেশ আপনার মনে হ'ল। কিন্তু চাঁদ আজ শেষ না হলেও আগামী দিন হয়ত নিঃশেষ হয়ে যাবে এই আকাশ থেকে–এতে বিশাল আকাশের খুব যে দুঃখ হবে তা–না। কারণ তারপর দিনই নতুন হাসি নিয়ে চাঁদ আসবে,বিকশিত করবে নিজের স্নিগ্ধতা পূর্ব দিনের চেয়ে বেশী। অথচ আমি? এই অঙ্গন থেকে বিদায় নিয়ে পুণরায় কর্মজীবনে নিজেকে বিকশিত করতে পারব? এর সোজা উত্তর 'না'। তবে কেন? প্রত্যুত্তরের বদলে প্রশ্ন আসে তুমি কি চাঁদের মতন নিয়ম মেনে চলেছো? নিজেকে তলিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করলাম না। এমনিতেই মনে এসে গেল সেই '৮৪ এর মাঝামাঝিতে এইচ, এস, সি দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিই ঐ বৎসরেরই ডিসেম্বরের শেষে। অথচ ক্লাশ শুরু হ'ল প্রায় দেড় বৎসর পর '৮৬ এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী। আজ '৯০ এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী চলে গেল। এখন পর্যন্ত বের হবার তো কোন আভাসই নেই বরং '৯১ এর ১৭ই ফেব্রুয়ারীর আগে বের হতে পারি কিনা তাও সন্দেহের শিকার হতে যাচ্ছে। সেই এস, এস, সি থেকে সব সময় Discipline রচনা মুখস্থ করে আসলেও বাস্তব জীবনে চরম বিশৃংখলাই রয়ে গেল। নাহ্ আমি কখনো চাঁদের মতন না। কারণ চাঁদ প্রকৃতির এক বিস্ময়কর নিয়মে আবদ্ধ। আমি এক সময় প্রকৃতির থাকলেও এখন আমার জীবনকে প্রকৃতি থেকে পৃথক করে ফেলেছি। যার জন্যই জীবন হয়ে গেছেবিশৃংখল।

শুধু 'আমি' বললেও এই লেখাটা সমাপনী বর্ষের যেকোন 'ছাত্র–ছাত্রীই পড়ো না কেন আমার মনে হয় তোমার মনের সমান্তরাল প্রতিফলন পাবে আমার কথা গুলোতে। সমাপনী বন্ধুরা, '৮৩ এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র হত্যার সংবাদ আমাকে যেমন বাসা থেকে রাজপথে নিয়ে এসেছিল ঠিক তুমিও অন্তঃত একটুকু বিচলিত না হয়ে পারোনি। ঐ বছরেই ২৮শে নভেম্বর ঘেরাও অভিযানে আমি প্রথম সারিতে না থাকলেও আমি নিশ্চিত আমার অনেক বন্ধুই সেদিন ছিল সকলের সামনের সারিতে। '৮৪ সালের মার্চ মাসে সেলিম দেলওয়ারকে পুলিশের গাড়ী চাপা দিয়ে হত্যার ঘটনাতো বেশী দিনের নয়। সমাপনী বন্ধুরা, সেদিন কি তুমি চুপ থাকতে পেরেছিলে? '৮৫ সালের অক্টোবরে জগন্নাথ হলের ছাদ ধ্বসে পড়ে অবহেলার শিকার অসংখ্য ছাত্রের করুণ মৃত্যুতে তুমি কি তোমার রক্ত দিতে ঢাকা মেডিক্যালে আমার মত ছুটে যাওনি? তারপর '৮৬ সালের ২১শে মার্চের কালো রাত্রে সমস্ত বিবেককে পদদলিত করে স্বৈরাচারের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য নীলনক্সার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয় যে সকল

'৮৪–র স্বৈর শাসনের কাছে জনগণের দাবী

দল, তাদের প্রতি ঘৃণায় কি তুমি থু থু ছুড়ে মারনি? তাহলে তো সবই মিল আছে তোমার সাথে আমার। কিন্তু এই মিল হতে গিয়ে এই শেষ বছরে কতো অমিল দেখতে পাচ্ছি তার শেষ নেই। চার বছরের কোর্স ছয় বছরেও শেষ হচ্ছে না। মরহুম নানার উৎসাহেই আমার এই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসা। সেই নানা আজ বেঁচে থাকলে আমার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার এতো দেরী দেখে একটু হলেও বিচলিত হতেন।

চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এইচ, এস, সি পাশ করার পর কি এক ভীষণ বিপদ নিয়ে পাড়ি জমাই এই বুয়েটে। ভাবলে অবাক লাগে। তখন প্রথমেই উঠি তীতুমির হলের ফখরুল ভায়ের রুমে। কি অপরিসীম স্নেহ-আদর দিয়ে উনি আমাকে বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন, আজ ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। ফখরুল ভাই এর ভালবাসা ছাড়া আমি বুয়েটে আসতে পারতাম কিনা সন্দেহ। ফখরুল ভায়ের রুমের একজন করত শিবির, একজন ইউনিয়ন, একজন বি, এন,পি এবং একজন তবলীগ। আমি আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করেছি আদর্শিক বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁদের ভিতর কি অদ্ভুত বন্ধুত্ব ছিল। বুয়েটে ঢুকেই এ ঘটনাটা আমার হৃদয়কে প্রথমে ছুঁয়ে যায়।

বুয়েটে ঢোকার পর বিভিন্ন অনুষ্ঠান শেষে কনসার্ট দেখতাম খুব উৎসাহের সাথে। কোন অনুষ্ঠানে কনসার্ট থাকলে সবার আগের সারিতে গিয়ে আমার বসা চাইই। '৮৮ এর র‍্যাগের কনসার্ট চলছে। অত্যাধিক ভীড়। বরাবরের মত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বেশীর ভাগ জায়গা দখল করে আছে। ইতিমধ্যে আরো কিছু বাইরের ছেলে এসে অডিটরিয়ামে ঢুকতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে একটা ককটেল ফাটায়। ছেলেরা সব হৈ চৈ শুরু করে দৌড়াদড়ি করতে থাকলে D.S.W স্যার এক পর্যায়ে এসে কনসার্ট বন্ধ করার নির্দেশ দিলে আমার মন যে কি ভীষণ খারাপ হয়েছিল, তা এখন মনে হলে হাসি পায়। অথচ এখন আর কেন যেন কনসার্ট ভাল লাগে না। বুঝতে পারি মন অনেকটা থিতিয়ে আসছে।

Lag lead কথাটা 1st year এ বুঝতাম না। এখন এই ছয় বছরের শেষ দিকে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। 3rd year এ Indusrial Law এ লাল বিল্ডিং এক আর ডিপার্টমেন্ট এক যোগ দিয়ে ল্যাগ মেক আপ যখন কানায় কানায় হয়ে গিয়েছিল তখন বুঝি Lag থাকার কি কষ্ট। বুয়েটে টিউশনি করাটা বিদেশের Part-time Job এর মতো, তা প্রথমে বুঝিনি। দেখতাম অনেকেই টিউশনি করে। পাশের রুমের জিয়া ভাই এক অদ্ভুত টিউশনি করত। ও কথা কাউকে বলার নয়। মাসুদের টিউশনির গল্প শুনে কত হেসেছি।

2nd year -এর পরীক্ষা শেষে Industrial Tour এ আমরা সবাই চিটাগাং ডকইয়ার্ডে যাই। সেখানের অডিটোরিয়ামে শীতের মাঝেই মেঝেতে আমাদের গণ-শোয়ার ব্যবস্থা হয়। এতেও খুব খারাপ লাগেনি। কিন্তু পরদিন যখন শুনলাম একটি মাত্র-বাথরুমে এই ১২০ জনের কাজ সারতে হবে তখন আমার চোখ কপালে উঠে গেল। আমার পার্টনার আতিক দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করল-ওসব প্রাকৃতিক কাজ এই Tour-এ সে করবে না। নিজেকে Control করবে। দু'দিন Control করার পর বেচারার জ্বর এসে গেলে সেকি অবস্থা! খ্যাঁতা কম্বল গুছিয়ে আমি চিটাগাং মেডিকেলে আতিককে নিয়ে Control এর হাত থেকে রক্ষা করালাম। ভাবতেই অবাক লাগে, এই সব ঘটনা এইতো সেদিনের। অথচ কত সময় চলে গেল।

ইনডাষ্ট্রিয়াল ট্যুর এ গণ বিছানায়

3rd year শেষে Industrial Training এ আমি এবং কামরুল ভাই কালিগঞ্জ সুগার মিলে যাই। কামরুল ভায়ের বাড়ী এই সুগার মিলের পাশেই। তাই কামরুল ভাইদের বাড়ীতেই Training এর একমাস কাটাই। ভাবীর চমৎকার ব্যবহার মনে থাকবে অনেকদিন। কামরুল ভায়ের সাথ আমার অনেক মিল পেতাম। মাঝে মাঝে মনেহয় বলি কিন্তু কখনও বলতাম না। অথচ একটু অন্যরকম কিছু দেখলে আমি ঝগড়া করে নিতাম একহাত। কামরুল ভাই আমার রুমের পাশেই ৪১৮ নং এ থাকেন।

পার্টির গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ ছেলেটি বুয়েটে যে ত্যাগ স্বীকার করেছে ভাবতে অবাক লাগে। এসব কথা এখন হৃদয়ে বেশী বাজে। আজ তাকেও ফেলে চলে যেতে হচ্ছে। সত্যিই জীবন এগিয়ে চলে সামনের দিকে আর আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি পিছনে ফেলে আসার পর।

সময় চলে গেছে। এমন অনেক সময় ছিল যার থেকে নিংড়ে নিতে পারতাম সুখের অনেক কিছুই। যেমন চলে গেছে আমাদের এই প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী। কিন্তু আমরা পারিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঐতিহাসিক দিনটিকে উৎসবমুখর করে তুলতে। এতে আমরা হারিয়েছি অনেক আনন্দ। শুধু সুখ আনন্দ বললে ভুল হবে, ছোট্ট এই জীবনে আরো নতুন কিছু শেখার সুযোগ ছিল ঐদিনে। আমাদের দরজায় রজতজয়ন্তী এসে সলাজভাবে কড়া নেড়ে চলে গেছে। তাকে আমরা আহবান করিনি এই অন্ধকুটিরে ঢুকে আলোয় উদ্ভাসিত করতে। আমাদের দুর্ভাগ্য। এই দুর্ভাগ্য তাড়িত কপালে বিষাদের ছায়া দেখে 'BUET DAY '90' বোধ হয় একটু আশার সঞ্চার করতে চেয়েছিল। কিন্তু তবুও যেন কোথায় একটা অতৃপ্তি রয়েই গেল। যাক ওসব কথা। আর যত যাই হোউক আমি অন্তঃত আর এই রজত জয়ন্তী পাব না। না পাওয়া যন্ত্রনা অনেক। আবার পেয়েও পেলাম না এই যন্ত্রণা অব্যক্ত।

আমি আলেকজান্ডার ও রোখসানা

1st year এ ঢুকেই 'Mechanical Festival' এর অনুষ্ঠানে খুব উৎসাহ নিয়ে আমি আর রুখসানা একটা অভিনয় করি। আমি আলেকজান্ডার হয়েছিলাম। সেদিন বিদায়ী এক ভাই আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আজ এই 'Mechanical Festival' এ আমার বিদায়ের পালা। কতো দ্রুত সময় চলে যায়!

জীবন জগৎসহ সব কার্য কানুনই এমনই ভাবে কালের চক্রে আবর্তিত হচ্ছে, এই কালের আবর্তে হারিয়ে যায় আমাদের শৈশব, কৈশোর যৌবনসহ সোনালী দিনগুলো। যা স্মৃতি কিংবা আত্মোপলব্ধি বলে পরবর্তীতে দেখা দেয়। আমার এই চির পরিচিত হল, ক্যাম্পাস, পাশের রুমের ছোট বড় বন্ধুগুলো, সব কালের চক্রে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে। এখন ছেড়ে আসার বেদনাটুকুই আমার সম্বল। কোন অন্ধকার রাতে এই বেদনাটুকুই আমাকে পথ দেখাবে। কবির মত আমারও হৃদয় চিরে সেই আশাবাদ বের হয়ে আসে–

"সময়ের সমুদ্র পাড়ায়ে
যে জীবন গিয়েছে হারায়ে
যদি সে ফিরেই ফের আসে
আলো হয়ে মনের আকাশে
চন্দ্র তারকার সাথে বসে একাসনে
সে সূর্য স্বরূপ
আমাকে দেখাবে বিশ্বরূপ।"

ক্লাস ধর্মঘট—রোধে তারে সাধ্যকার?

হাশমতুজ্জামান
৪র্থ বর্ষ, যন্ত্রকৌশল

৮৫'র জানুয়ারীতে ভর্তি হয়েছি বুয়েটে। এক বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে ক্লাস শুরু হল ৮৬'র ফেব্রুয়ারীতে। এখন ৯০-এর শেষপ্রান্ত। আমার পাস হতে দেরি দেখে বিদেশ থেকে মামা জানতে চেয়েছেন-আমি ক'বার ফেল করেছি? আর আমার দীর্ঘশ্বাস- BIT-তে চান্স পেয়েছিলাম, কেন যে ছেড়ে এলাম? এখন NET PROFIT-একটা সেকেন্ড ক্লাস, আর দেড় বছরের LAGGING.

এতো শুধু একজন নিয়মিত ছাত্রের ভাবনা। কিন্তু যারা এখানে আসার আগেই এক বছর ড্রপ দিয়েছেন কিংবা এখানে এসে এক বা একাধিকবার ঝেড়েছেন, কিংবা যাদের উপর নেমে এসেছে সাময়িক বহিষ্কারাদেশের পরোয়ানা; তারা কি ভাবছেন? পাশ করতে করতে বয়স শেষ, তার পর দ্বারে দ্বারে ধর্ণা, মামা খালু কেউ নেই বলে পূর্ব পুরুষকে গালিগালাজ (আজকাল মামা খালুরাও পয়সা চায়)। এসব দেখে বলতে ইচ্ছে করে-প্রিয় শুভাকাংখীরা, তোমরা দেখে যাও তোমাদের আশীর্বাদ পুষ্ট মেধাবী ছাত্রটির করুণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

কিন্তু কেন এই দীর্ঘসূত্রতা? যদি একজন শিক্ষককে এর কারণ জিজ্ঞেস করি, তিনি বলবেন- "ছাত্ররা অসচেতন, তারা বারবার পরীক্ষা পিছায়। বস্তির কেউ এসেও যদি গেটে লিখে দেয় 'আজ আমার নানার জন্মদিন উপলক্ষে ক্লাস বন্ধ,' ব্যাস,ক্লাস হবে না। যদি সামনের সারির একজন সিরিয়াস ছাত্রকে এর কারণ জিজ্ঞেস করি, সে বলে- "ছাত্ররা ক্যান যে গেট আটকায় বুঝি না। এর জন্য স্যাররাও দায়ী। তাঁরা সিলেবাস দিয়ে দিলেই পারেন, ক্লাস হোক কিংবা না হোক সিডিউল টাইমে সেই সিলেবাসে পরীক্ষা হবেই।" আর যদি পিছনের বেঞ্চের একজন রিপিটার ভাইকে প্রশ্ন করি, তিনি বলেন, "স্যারদের ঝাড়ি খেতে আর ভাল লাগে না, তাই ক্লাসে যেতে ইচ্ছে করে না। মিজান স্যার ক্যান যে ক্লাসে শুধু শুধু এরশাদকে স্বৈরাচারী বলে গালি দেন, বুঝি না।"

যখন ইউকসু ছিলনা, সবাই ভাবত,ছাত্রদের নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই, তাই ছাত্ররা মিসগাইডেড হচ্ছে। যখন ইউকসু আসবে, গেট আটকানো উঠে যাবে। সুধী পাঠক, গেট আটকানো এখন যে আগের চেয়ে কত সহজ হয়ে গেছে তাতো জানেনই। সম্প্রতি সরকার এক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সরকারী ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করেছেন। এর জন্য মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা ক্লাস ধর্মঘট করেনি। আমরা একদিন ক্লাস বন্ধ করে এ নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ করেছি। কিছুদিন আগে ডাকসুর ভি,পি, জি, এস পুলিশের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। আমাদের এ অঙ্গনের গর্বিত সন্তানেরা পরের দিন ক্লাস বন্ধ করে এর নিন্দাজ্ঞাপন করেছেন। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরের দিন ঠিকই ক্লাস হয়েছে। ছাত্রী মিছিলে হামলার প্রতিবাদে রোকেয়া-শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা ক্লাস বন্ধ করতে পারেনি, অথচ আমাদের ছাত্রী বোনেরা একদিন গেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছেলেরা সেদিন কেউ ঢোকার চেষ্টাই করেনি। এখন ক্লাস আটকানো হয়ে উঠেছে আমাদের প্রতিবাদের ভাষা, আন্দোলনের ভাষা, মৃত্যু বার্ষিকী পালনের ভাষা এবং নিন্দাজ্ঞাপনের একমাত্র ভাষা।

কিন্তু কে ভাংবে এই শৃংখল? ইউকসু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সুতরাং আমাদের অধিকার আছে, তাঁদের কাছে। আমরা বলব, বিচ্ছিন্ন ক্লাস ধর্মঘটের কারণ যাই হোক না কেন তাঁরা এটা রোধতে পারছেন না বলে প্রথমেই দায়ী হবেন তাঁরা। ইউকসু কি পারেন না এই মনোবল নিয়ে এগিয়ে যেতে যে তাঁরা যেহেতু ছাত্রদের প্রতিনিধি সেহেতু কখন ক্লাস ধর্মঘট হবে তা নির্ধারন করবেন একমাত্র তাঁরা। নাকি তাঁরা ভয় পান যে এ বিবৃতি দিলে পরবর্তী নির্বাচনে ছাত্র-ছাত্রীদের রায় বিপক্ষে যাবে। গত

ইউকসু নির্বাচনে যখন হলে হলে মিছিল করছিলাম– 'ফরিদ–রাফেল', 'ফরিদ–রাফেল', পাশ থেকে বিরোধী দলের কে একজন গলা মিলিয়ে বলছিল, 'ফরিদরা–ফেল'। নির্বাচনে উৎরে গেলেও আজ তলিয়ে দেখছি ফরিদরা আসলেই ফেল। (মাফ করবেন ফরিদ ভাই)

এ অবস্থার জন্য প্রশাসনও কম দায়ী নন। সবকিছু ঠিক থাকলে সুইচ টিপার সাথে সাথে একটা যন্ত্র যেমন তার স্বাভাবিক নিয়মে চলবেই–তাঁরাও সবকিছু দেখতে চান ঠিক সেই যান্ত্রিক ভাবেই। একই বর্ষের একগাদা ছাত্রদের ডঃ রশীদ হলে সীট দেয়া, ক্লাস টেস্ট আন্দোলনের সময় আচমকা হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া, দক্ষ উকিলের পরামর্শ ছাড়াই ছাত্রদের বহিষ্কার করা–সবকিছুতেই প্রশাসনের অপরিণামদর্শিতাই লক্ষ্য করা যায়। আমার মনে হয় এখন চিন্তা করার সময় এসেছে যে এই বুয়েট আহসান উল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নয়, কিংবা ষাটের দশকের এক ভিন্ন গ্রহ নয় যে সে সময়ের প্রণীত ফর্মুলায় এটা এখনও চলবে। ছাত্ররা কেন ক্লাস করতে চায় না তার পিছনে নিশ্চয়ই কোন একক কারণ জড়িত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন দুর্ঘটনার সাথে সাথে যেমন তদন্ত কমিটি গঠন হয় তেমনি এ ব্যাপারেও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ছাত্রদের সাক্ষাৎকার নিলে সম্ভবতঃ আসল কারণগুলো বের হয়ে আসবে। পরিস্থিতি বুঝে Cycle System চালু করা এবং সেই সাথে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করলে সুফল পাওয়া যায় কিনা তা–ও ভেবে দেখার প্রয়াস আছে বলে মনে করি।

শেষ করার আগে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জননন্দিত (?) ছাত্রনেতা বদরুল ভাইকে–যার অজ্ঞতার কারণে আমরা আরো কয়েকদিনের অনাকাংখিত ক্লাস ধর্মঘট থেকে মুক্তি পেয়েছি। আরব বিশ্বে মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতির প্রতিবাদে বাংলার সাদ্দাম বদরুল ভাই বুয়েটে অবিরাম ছাত্র ধর্মঘটের আহবান জানিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না তাঁর আগেই ইউকসু ঐ দিন থেকে অবিরাম ছাত্র ধর্মঘট ডেকেবসেআছেন।

তলাহীন কুয়ো

মাহবুব–ই–ফরিদ (তুমান)

৩য় বর্ষ, যন্ত্রকৌশল

'তলহীন কুয়ো' – ভাবতে বেশ মজা লাগে তাইনা? যদিও বাস্তবে তা খোঁড়া একেবারেই অসম্ভব [সবচেয়ে গভীর কুয়োর গভীরতাও মাত্র ৭·৫ কিলোমিটার) তবু কল্পনায় ভাবা যাকনা এরকম একটি কুয়োর কথা! পৃথিবীর ব্যাসার্ধ (বিষুবরেখাকে পরিধি ধরে) প্রায় ৬০০০ কিঃ মিঃ। অতএব ধরে নেওয়া যাক উত্তর মেরু থেকে খোঁড়া শুরু করে দক্ষিণের মাটি ফুড়ে বের হওয়াটা সম্ভব (অষ্টাদশ শতাব্দীর গণিতবিদ মপেখটুই এবং দার্শনিক ভোল্ট্যায়ারও তাই কল্পনা করেছিলেন)। তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?

মনে করি আমাদের একজনকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হল সেই কুয়োতে (স্রেফ তর্কের খাতিরে)। সে পড়তে থাকবে এই কুয়োর অসীম গভীরতা বেয়ে–কিন্তু কতক্ষন? যদি বাতাসের বাধা উপক্ষো করা যায়। তবে ফরাসী জ্যোতির্বিদ ফ্লামারিওঁর মতে তার লাগবে চুরাশী মিনিট চব্বিশ সেকেন্ড। অবশ্য তার এই ভ্রমণের পুরোটাকে ঠিক 'পড়া'নামে অভিহিত করা যাবে না কেননা পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দুতে পৌছাবার পর তার অবনতির বদলে হতে থাকবে উর্ধ্বগমন এবং তা চলতে থাকবে অন্য মুখ (তলা যেহেতু নেই) দিয়ে বেরোন পর্যন্ত। বেরোবার পর তার গতি শ্লথ হয়ে শূন্যে পৌছাবে ও পুনরায় তার

অধোঃগমন শুরু হবে ও ঠিক সরল দোলকের মতই সে পুনরায় উত্তর মেরুর মুখের দিকে ধাবিত হবে। এখন মনে প্রশ্ন জাগে যে যেহেতু পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলেই যত মাধ্যাকর্ষণ, সেখানে তার যাত্রার সমাপ্তি কেন হবে না। আসলে পড়তে পড়তে তার গতি এত বেড়ে যাবে যে কেন্দ্রস্থলে পৌছাবার সময় তার গতি থাকবে সেকেন্ডে ৮ কিলোমিটার (!!)। এভাবে সে অনন্তকাল ধরে দোল খেতে থাকবে। অবশ্য যদি বাতাসের বাধাকে উপেক্ষা না করা হয় তবে তার এই দোলনের বিস্তার ক্রমশই কমতে কমতে এক সময় শূন্য হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর কেন্দ্রেই তার এই অভিনব যাত্রার ইতি হবে।

যদি গর্তটা খোঁড়া হত অন্য কোন অক্ষাংশে, তা হলে তার এই ভ্রমণের গতির সাথে যোগ হত পৃথিবীর ঘূর্ণণগতি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে প্যারিসের প্রতিটি বিন্দুর ঘূর্ণন গতি সেকেন্ডে তিনশ মিটার আর বিষুবীয় অঞ্চলে যে কোন বিন্দু ঘুরছে চারশ ষাট মিটার প্রতি সেকেন্ডে। অতএব এই ক্ষেত্রে যদি কেউ পড়ে, সে কুয়োর গায়ে বাড়ি খেতে খেতে পড়বে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হবে যদি কুয়োটা দক্ষিণ আমেরিকার কোন মালভূমিতে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে দুই কিলোমিটার উপরে খোঁড়া হয়. তবে পতনের পর আরেক মুখ হতে যে বেরোবে সে সাঁ সাঁ করে আকাশের দিকে দুই কিলোমিটার ধাবিত হবে। আর যদি দু'টো মুখই সমুদ্রপৃষ্ঠের একই সমতলে থাকে, তা হলে এক মুখ হতে পড়ে অন্য মুখে পৌছান মাত্র তার হাত ধরে তাকে উঠিয়ে নেওয়া যাবে। যদি এতোসব সম্ভব হত, কি মজাই না হতো!

প্রকৌশল বাংলাদেশে

বিদ্যুৎ আইচ

৪র্থ বর্ষ/যন্ত্র কৌশল

একটি সদ্যোজাত স্বল্পোন্নত দেশের গঠনে একজন প্রকৌশলীর ভূমিকা অগ্রগন্য। শৈশবে এই সত্যকে অনুধাবন করে প্রকৌশলকে পেশা হিসাবে নেবার তাগিদ অনুভব করি। শুরু করি সাধনা। পথে দেখা হয় একই ইচ্ছা পোষণকারী অনেকের সাথে। কাউকে সাথে নিয়ে কাউকে পথে রেখে এসে প্রকৌশল অধ্যয়নের যোগ্যতা অর্জন করি। প্রকৌশলী হবার যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হয়ে এখন প্রবেশ করতে যাচ্ছি কাঙ্খিত মহান পেশায়।

সেদিনের সে শিশুর শত প্রয়াসে আজ আমি তার বহলালিত স্বপ্ন আশার বাস্তব মূর্ত প্রতীক। তারপরও আমার বলতে হচ্ছে তার আগামী স্বপ্নের বাস্তব রূপকার আমি হতে পারছি না। যে মহতী চিন্তায় আমার প্রস্ফুটন তার অবশিষ্ট আমাতে নেই। তাকে আমার বলতে হচ্ছে তুমি চেয়েছ প্রকৌশলী হতে ব্যাস হয়েছ, ভুলে যাও যা করার কথা ভেবেছিলে। সেদিনের শিশুর মত আজ যারা তাদের আমি হতোদ্যম করছি না। তবে উৎসাহ দেবারও আমার কিছু নেই। কাউকেই এখন আমার কিছু দেবার নেই। কথা থাকলেও পারবো না রাখতে। আমাকে বিদেশে একটি চাকরি দাও আমি চিরদিনের মত চলে যেতেও রাজি আছি, কোনদিন আসব না। আমার বিবেক আমাকে একটুও দংশন করবে না দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য, যারা আমার পড়ার খরচ যুগিয়েছে। আমার বিবেক সমাজের ঘুনে খেয়ে ফেলেছে। আমার প্রতিপালক পিতামাতাকেও আমার কিছু দেবার সাধ্য নেই (বেকার বলে নয়, কর্ম হলেও)। আমার আত্মীয়স্বজন হয়ত

আমাকে লজ্জা না দেবার জন্য মুখ ঘুরিয়ে রাখবেন। আমার চক্ষুরও পাতা নেই। ঘুনে খেয়েছে।

সব আশা ভাসিয়ে দিয়ে আমি পেশাও ত্যাগ করতে পারি। অবাক হবার কিছুই নেই। কয়জন পাশ করা প্রকৌশলের ছাত্র B. C. S পরীক্ষায় ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডারে পরীক্ষা দেয়? ৬/৭ বৎসর ধরে এ অধ্যয়ন কি মারামারি, কাটাকাটি বিচারের রায় দেবার ম্যাজিষ্ট্রেট হবার জন্য? দুই বৎসরে সিম্পল গ্রাজুয়েশন করেইতো তা সম্ভব। কিছুদিন আগে একটা পরিসংখ্যান দেখেছিলাম। কিসের তা মনে পড়ছে না। তাতে বলা হয়েছে বাংলাদেশে শতকরা আড়াই ভাগ জি এন পি বাড়ানোর জন্য বৎসরে ১২৯৩ জন এবং শতকরা পাঁচভাগ জি এন পি বাড়ানোর জন্য প্রায় চব্বিশশত জন প্রকৌশলীর আউটপুট প্রয়োজন। সন্ধ্যে বেলা টিভির নব অন করলেই উন্নয়নের যে হিড়িক পড়ে যায় তা দেখে মনে হয় না আদৌ প্রয়োজন আছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ এখানে একটা ক্যান্টনমেন্ট, ------ পার্ক বা গরুর খামার করা যাবে।

কিছুদিন আগে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের একটি সেমিনারে গিয়েছিলাম। অনেক কৃতি প্রকৌশলী সেখানে এসেছিলেন, বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁদের কণ্ঠেও ক্ষোভের একই সুর বাজতে দেখলাম। তবে তাঁরা মহান এ কারণেই যে সহজে আমার মত হতাশ হন না, প্রচন্ড অন্ধকারেও পথ চলার আলো দেখতে পান। ফেরার পথে স্যারের কাছে নিজেদের হতাশার কথা বললে স্যার সাহস যুগিয়ে বললেন, "চিন্তা করো না। মেধা থাকলে শ্রম দিলে মিষ্টির ঠোঙ্গা বানিয়েও মাসে পাঁচ/ছয় হাজার টাকা উপার্জন করা যায়।" মনে মনে ভাবলাম হয়তো তাই করতে হবে নতুবা ঘোড়া বা গাধার মালিক খুঁজে বের করতে হবে। আহসান উল্ল্যা হলের মাঠে যা বড় বড় ঘাস তা কাজে লাগানো যাবে।

সরকার আবার কৃচ্ছতা সাধনার্থে চাকুরীতে নিয়োগ বন্ধ করেছেন। দেশের উন্নয়নের চালক প্রকৌশলী। দেশের সম্পদ অব্যবহৃত রেখে উন্নয়ন কি সম্ভব? পৃথিবীর ইতিহাসে উন্নয়নের এমন নজির আছে বলে আমার জানা নেই। কারো জানার কথাও নয়। গত দু'দশক ধরেও তো বাংলাদেশে পরীক্ষা হল, পর্যবেক্ষণ হল। এখনও সিদ্ধান্ত নেবার সময় আসেনি?

সেদিন সে সেমিনারের বিষয় ছিল বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্টে টেকনোলজী ট্রান্সফার ও অ্যাসিমিলেশান। এই প্ল্যান্টটি ৭৩% নিজস্ব উপকরণে ডিজেল ইঞ্জিন বানাতে সমর্থ হলেও এর বিপননের সুযোগ না দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়, ঋণদাতা ও অনুদান দাতা দেশের নির্দেশে। প্রায় বিনা আপত্তিতে সে নির্দেশ গলাধঃকরণ করা হয়। অবশ্য তাতে উৎসেচক থাকে গ্রন্থি নিসৃত নয়, মজ্জাগত। পাঁচটি সার কারখানা নির্মাণ করার পরও ষষ্ঠ ও সপ্তমটির জন্য সম্পূর্ণ বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। আর তালা খোলার জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের।

সঠিক কারণ চিহ্নিত না করে বিজাতীয় করণের মাধ্যমে সমস্যা দুরীকরণের অপচেষ্টা হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং নির্ভর বড় বড় কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যা একান্তভাবে ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার কথা তা হচ্ছে না।

অপরিকল্পিত অর্থনীতির জন্য দেশে অর্থ নিয়োগের পরিবেশ বিশৃংখল ও অনির্ভরযোগ্য। এ কারণে পুঁজি বিনিয়োগ সক্ষম ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যথেষ্ঠ পুঁজি নিয়োগ করতে উৎসাহ বা সাহস পান না। দক্ষলোক নিয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে না, তাই প্রকৌশলীদের চাহিদা কমে গেছে, পণ্যের মান বাড়ছে না। দেশীয় পণ্যের নিম্নমানের অজুহাতে বিদেশী জিনিস আমদানী নিষিদ্ধ হয় না। কিন্তু এটাও ঠিক যে দেশীয় পণ্যের বাজার সৃষ্টি করার সুযোগ না করলে মানের উন্নয়ন সম্ভব নয়। পণ্য আমদানী হচ্ছে কিন্তু প্রযুক্তি আমদানী হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রযুক্তি চেইন-রি-অ্যাকশনের মত প্রযুক্তি ছড়ায়। যেমন অ্যামোনিয়া সার তৈরীর কথা ধরা যাক। এরজন্য প্রয়োজন N_2 ও H_2, N_2আসে বায়ু থেকে আর H_2 আসে পানি থেকে। উভয় প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে আসে O_2। এই O_2 বিভিন্ন কারখানায় অতি প্রয়োজনীয়। পানিতে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়েটেরন বা ভারী হাইড্রোজেনও থাকে অল্প পরিমাণে। এই ডয়েটেরনের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় তৈরী হয় ভারী পানি। প্রচুর দামী এ পানি পরমাণু শক্তি কেন্দ্রগুলিতে শীতক এবং অত্যন্ত শক্তি সম্পন্ন নিউট্রন কণার শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। অ্যামোনিয়া সার তৈরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠছে কত শিল্পকারখানা। আমাদেরও এখন প্রয়োজন প্রযুক্তির চেইন-রি-অ্যাকশন।

শতাব্দীর দাতা

মুঃ আবদুল্লাহ—আল—বাকী
তৃতীয় বর্ষ, যন্ত্রকৌশল

শতাব্দীর দাতা আমি।
মৃত্তিকার জল, তাতে বেড়ে ওঠা বৃক্ষের ছায়া
ভেসে থাকা দাহপিন্ডের পাঠানো
অন্ধকারের যম – অস্তিত্ব রক্ষার খাদ্যপ্রাণ
শোষণের বিরুদ্ধে ছুঁড়ে ফেলা কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর

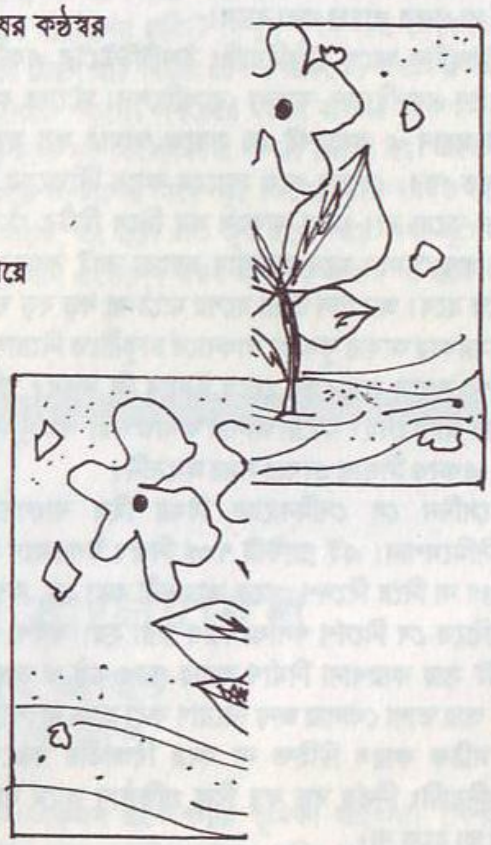

কিংবা ধরো,
সভ্যতার প্রভাবক–তোমার ঐ স্কেচপেন,
তোমার ঐ ড্রইংশীট,
অট্টালিকার নমুণা তৈরীতে অপরিহার্য্য
টিউবের ঐ আইকা – সব, সব কিছুর দানকে ছাপিয়ে
আমি শতাব্দীর দাতা।

ভিখারী বলে যারা পেছনে ফিস্‌ফিস্ করে,
তাদের সবাইকে আমি ডেকে বলি, – 'দেখো,
আজন্ম রোদ্রের জ্বালায় দগ্ধ আমার কুটির,
উপস্থিত বন্যায় তা আবার যথাবিহিত প্লাবিত
তবুও কারো দ্বারে কখনো কড়া নেড়ে বলিনি –
আমি ভিখারী, আমায় ভিক্ষা দাও।'

আমি যীশুর মতই পার্থিবে শুন্য,
কিন্তু অপার্থিবে উপচানো।

কাঁধে যে ঝুলি দেখে –
তোমরা আমায় ভিক্ষুক বলে ঠাওরে থাকো,
স্বর্গ থেকে স্বস্তির শীতলতা এনে
আমি তাতে তা ভরে রেখেছি,
বয়ে বেড়াচ্ছি তাতে – বিস্ময়ের প্রদীপ্ত দৃষ্টি,
বিশ্বাধরের মাদল হাসি,
আর ভালবাসার কিছু নগ্ন সংলাপ।
বহুদিন থেকেই, এদের ভারে, আমি বেশ ভারাক্রান্ত।
ভারমুক্ত হবার আশায়, তাই ত',
আজ আমি
ভিখারীর বেশে 'শতাব্দীর দাতা'।

বসন্ত এবং কবিতা

মোঃ আদম আলী
১ম বর্ষ, যন্ত্র কৌশল

১·
কবিতার গদ্যে ভালবাসা বনফুল হয়ে ফোটে
অকস্মাৎ কুড়িয়ে পাওয়া ঝিণুক মুক্তোর মত
শোভা পায় প্রেয়সীর ঠোঁটে
বসন্ত এলে কবিতারা সক্রিয় হয়ে ওঠে
ধারকাছের ডাষ্টবিন থেকে কুড়োয়
দোতালার জানালা দিয়ে ফেলে দেওয়া
প্রত্যাখ্যাত ভালবাসার ফুল!
কবিতা তাকে আবার
কুমারীর বেণীতে রাখে
প্রেমিকেরা হাসে
কবিতা গদ্যে কথা কয়ে উঠে
আমিও পারি শত শত ভালবাসার
অনির্বচনীয় সংলাপ রচনা করতে
যেমন পারে বসন্ত
শত শত ফুলের বাসর সাজাতে!

২·
বসন্ত এলেই কৃষ্ণচূড়া হয়
কবিতার লাল পদ্ম,
অনেক কথার শ্বশুর বাড়ি,
কৃষ্ণচূড়ার আবাস–ভূমি
বাসর–সজ্জা হয় অনেকের
কিন্তু কবিতার এত নীচে নামা অর্থহীন
ও কেবল শব্দের মহড়ায়
সে চৈতণ্যের কথা বলে
মাঝে মাঝে প্রকৃতি বিরূপ হলে
কবিতা তা এড়িয়ে যায়
কেননা সে জানে
ভালবাসার গভীর মুহূর্তে
মনে থাকে না বসন্ত ছাড়া
অন্য কোন কথা,
অন্য কোন সুর!

অলংকার

হাশমতুজ্জামান
৪র্থ বর্ষ,যন্ত্রকৌশল

যখনই অলংকার পরি
মনে মনে ভীষণ লজ্জা পাই,
এবং দুঃখও হয়,
আমি কুৎসিত –
অলংকার আমার দেহে মানায় না।

জীবনযুদ্ধে অস্ত্রহীন
এক যোদ্ধা আমি,
আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত
আমার যান্ত্রিক মন।
এইসব–
আমাকে দিয়ে সাজে না।

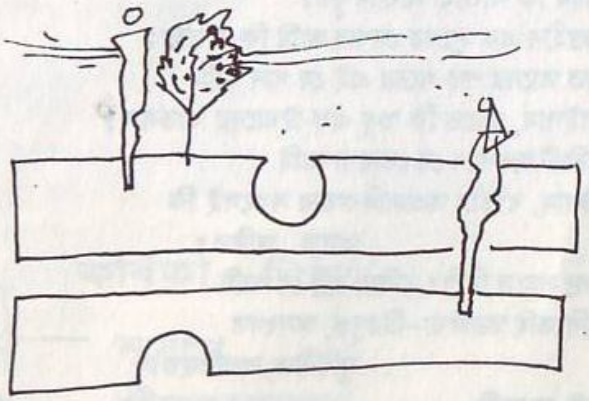

ভন্ডামীটা রুখতে চাই

মাহবুব
৪র্থ বর্ষ, যন্ত্রকৌশল

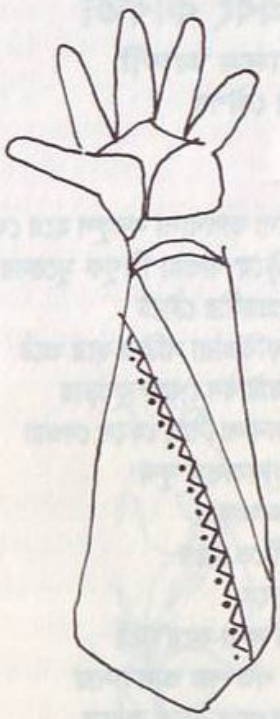

বক্তৃতাতে দেশপ্রীতি আর হৃদয়টাতে অন্য কেউ,
মনসাগরে ঝড় তুলে সেই, হাওয়া হাওয়ার তপ্ত ঢেউ,
নট–নটীদের খিস্তি খেউর, নগ্ন উরুর নৃত্যে একি–
দাবানলের গ্রাস লেগেছে; বাংলাদেশের চিত্তে দেখি
উথাল পাতাল তাল তুলে দেয় সাগর পাড়ের বাদ্যগান;
ওরা দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখে কল্কিতে দেয় সুখের টান,
পয়সা উড়ায়, নেশার গুঁড়ায়,
গরীব লোকের ভাত মেরে খায় –,
শিল্পসেবার এই ভন্ডামী রুখতে হবেই, রুখতে তাই
দেশগতপ্রাণ একগুচ্ছ আগুন ঝরা পলাশ চাই।।

পদস্খলিত

বনি ওয়াহিদ
৩য় বর্ষ, যন্ত্রকৌশল বিভাগ

আমি কি সত্যিই আত্মবিস্মৃত?
অন্তহীন এক সুখের নেশায় আমি কি উদ্ভ্রান্ত?
শত তানের শত লয়ের এই যে গান আমি
গাইলাম, তাতে কি শুধু এক উম্মাদের আর্তনাদ?
প্রতিটি জনপদে যে ঘোষণা আমি
দিলাম, বার্তার অপ্রাসঙ্গিকতায় সকলেই কি
তাতে স্তম্ভিত?
রুদ্র সমুদ্রে মিলিব বলিয়া এই যে আমি
চলিতেছি তরঙ্গিয়া–চিরদৃপ্ত, অসংগত
দুর্বিনীত, অপ্রতিহত!
এই যে আমি,
গ্রাসিয়া চলিতেছি নগর, গ্রাম,
মুছিয়া ফেলিতেছি সকল অতীত,
ব্যাপৃত করিয়াছি সহস্রভুজ প্রলয়ের কাজে!!
সদা সতর্ক নিশ্চিত সম্মুখকে এই যে আমি
ঠেলিয়াছি অনিশ্চিত এক কুটিরে!!!
বিরহের সুখ আহরণে আমি কি বিরহী?
দুর্বোধ্য প্রেমের গুপ্ত বিচিত্রতায় আমি কি
সত্যিই পদস্খলিত??

কাব্যে আতংক

তপন মজুমদার
১ম বর্ষ, যন্ত্রকৌশল

কবিতার রচনাতে নেই আর দ্বন্দ্ব,
নেই ভাব; নেই ভাষা; নেই কোন ছন্দ।
যে যেভাবে পারে তাই,
কবিতা লেখে ভাই,
কবিদের সংখ্যার নেই কোন সীমানা,
বুনো কবি, ঝানু কবি–আজকের জামানা।
রবীন্দ্র–নজরুল, সুকান্ত–মাইকেল
আজকাল তারা তাই কবি নয়–রাস্কেল।
কবিতা লেখাতে লাগেনাতো লাইসেন্স,
পুরানো কবি সব–আজ তাই ননসেন্স।
কবিদের সংখ্যা বেড়ে গেলে এ ভাবে,
পঁচে যাবে কাব্য–পড়ুয়ার অভাবে,
আমি তাই ভীত হয়ে, কবিতা লেখা ছেড়ে,
কবিতার বইসব গুম হয়ে যাই পড়ে।
কবিতা পড়ে আজ নেই কোন শান্তি,
অর্ধেক শুদ্ধ; আর অর্ধেক ভ্রান্তি।
সাহিত্যের এ কলঙ্ক,
মনে আনে আতঙ্ক,
শেষে বুঝি পড়া–লেখা সব ছেড়ে,
নিতে হবে কবিদের কাব্যিক প্রাণ কেড়ে।

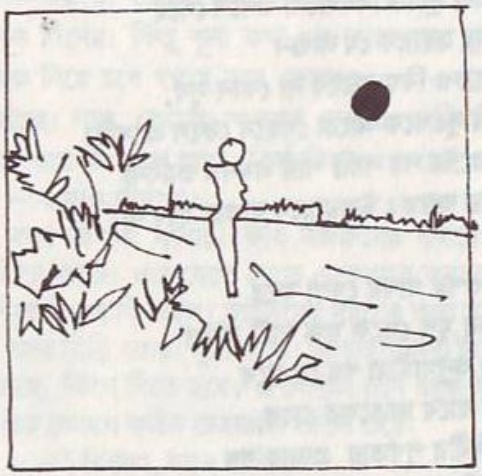

কবিতা মিঠুর

স্মরণে

শহীদদের সবার স্মরণে
২১শে ফেব্রুয়ারীর দিনে,
সবাই এক সাথে
ফুল দিতে যাই মিলেমিশে,
শহীদমিনারে।

ফুলের গন্ধে শহীদেরা জেগে ওঠে,
শহীদেরা ফুলের মাঝে হাসে,
তাদের জন্য দোয়া করি মনে মনে,
সব শেষে ফিরে
আসিবাড়ীতে।

স্বাগতম

মোছাঃ রমজান আলী
সমাপনী বর্ষ

(নবীনদের প্রতি উৎসর্গীকৃত)

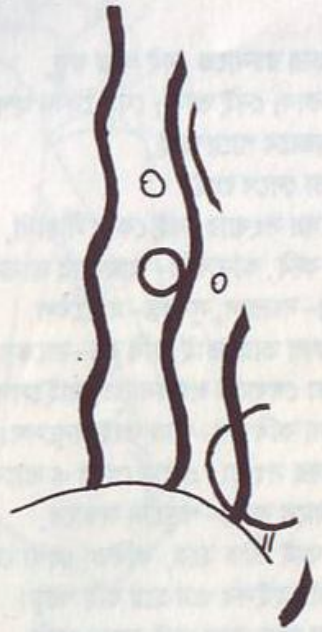

সুসজ্জিত পুষ্পমালার সৌরভে,
পল্লবিত তরুলতার নব আয়োজনে,
ধন্য হয় সম্বর্ধনায় যেমন প্রতিটি বসন্ত আগমন–
এমনই আয়োজন শেষে পৃথিবী প্রতীক্ষমান ভেবে,
জ্যৈষ্ঠে আগমন করে মেঘমালা।
কিন্তু–
প্রিয়তমা পৃথিবীকে প্রেরিত ক্ষয়মান রবির আলোকমালা
আজও বিশ্বাসঘাতকায় লিপ্ত–
করেনি সে তাই প্রিয়াকে সুশোভিত, তুষ্টিত।
পিয়েছে অমৃতসাগর আর
ঝরিয়েছে মায়াময় তরু পল্লব,
শীর্ণ তার বাসন্তী যৌবন পঙ্কিল মাদকতায়।
লাঞ্ছিত এ প্রিয়ার আর্ত হাহাকার,
নিষ্পেষিত মানব সন্তানের এ দুঃখ আয়োজন,
বসন্তকে সম্বর্ধনার মতো তোমার আগমনে –
বিহঙ্গের ললিত কলা আর কুসুমিত তরুর অসজ্জিত ফটক।
শাহানামা সম অমৃত–পায়ীদের মতো,
মোদের জীর্ণতা, জড়তা আজি বিদূরিত,
সবকিছু অগোছালো, উজ্জীবিত, নবতম,
হে মহান অতিথি! তোমায় স্বাগতম।

উত্তরসূরীদের জন্য

মোঃ মনজির আহমদ
৪র্থ বর্ষ, যন্ত্রকৌশল

আমাদের সুখের দিনগুলো ঝলসে গেছে
জীবনের হন্তারক যে আগুন
তাকেও বিদ্ধ করবে না কোন সূর্য,
আমি দুঃখকে আরো পেছনে ফেলে এসেছি।
রক্তক্ষরণের পর শান্তি পাব এমনও ভাবিনা
আমার অন্ততঃ উত্তরায়নে যাওয়া হবে না।

বুকের ওপর পাথর খেলা করে
শেকড়ের মূল থেকে দগ্ধ মাটি কাঁপে
একদিন অনুগামীরা পথ দেখাবে
রেখে যাবে ঘাতকের চোখ,
মুক্ত পৃথিবীর পূর্ণতার প্রজ্ঞায় পথ
জ্বলবেআবির্ভাবে।

শূন্যদৃষ্টি

মোঃ আদম আলী
১ম বর্ষ/যন্ত্র কৌশল

ঘুনে ধরা বাঁশটার সাথে রিকসায় তালা লাগায় বদর। ঘামে তাঁর শরীর ভিজে গ্যাছে। লবণাক্ত একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। বস্তির একপাশে হেলান দিয়ে বসে সে। গামছা দিয়ে মাছি তাড়ায়। শব্দশুনে খড়কুটো আর পুরানো কাঁথার খুঁপড়ি থেকে বেরোয় তার বউ। বিয়ে করেছে বেশীদিন হয়নি। স্বামীর লাগাতর পরিশ্রম তার গতরেও সয়না। অন্যের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করলেও স্বামীর কষ্টটা তার মনে লাগে। মানুষটা সারাদিন রিকসা চালায়। বউয়ের যতটুক করা উচিত ও তার সবই করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। যেখানে টাকা নাই, সেখানে মনও থাকে না। তবু বলে,

-'অমন কইর‍্যা কাম না করলে কি অয় না। আমাগো তো আর পোলাপাইন নাই। দুইজন। টুকটাক অইলেইতো চইল্যা যায়।' বদর কোন কথা বলে না। ও আজকাল জীবনের অনেক গোপন কথা জানে। তৈরী সোহাগের কথাগুলো সহজে পৃথক করতে পারে। তার মনের ভাবান্তর হয় না। বউয়ের দিকে চেয়ে থাকে। বউ তার থেকে গামছা নেয়। গায়ের ঘাম মুছে দেয়। মনে হয়, কে একজন আদর করে তার হিরে জহরত পরিস্কার করছে। নেকামীর ভান নেই। তবু বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলে,

-'আইচ্ছা বউ, তই কি সুখী অইছস?

-'এই কথা জিগান ক্যান? বস্তির বউগো আবার সুখ-অসুখ আছে নাকি!'

-'কি জানি। মনডা বালা না। চোহে কেমুন জানি আন্ধার লাগতাছে। বলে বদর বিড়ি বের করে। টানতে ইচ্ছে করছে না। বিড়িটা হাতের মধ্যে আঙ্গুল বদল হতে থাকে। উদাসীন হয়ে আকাশের দিকে তাকায়। ওখানে কেবলই নীল।

দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে বদর। বউ এ নিশ্বাসের কোন মানে বোঝে না। কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে স্বামীর চোখের দিকে চেয়ে থাকে।

-'বউ পানি দে'

মাটির কলসি থেকে আধ ভাঙ্গা গ্লাসে পানি দেয় বউ মর্জিনা। বদরের রাগ ধরে। কিন্তু কিছু বলেনা। যা সাধ্যির মধ্যে নেই, তাঁর জন্য চিল্লাচিল্লি করা পাপ। ও শুনেছে। তাই নিরব থাকে।

রিকসা চালালে বদরের নিরবতা আরো বেড়ে যায়। ওর মত লোকদের ও রিকসায় চড়ায় না। প্যান্ট-শার্ট পড়া লোকদের বেশী নেয়। ওদের কাছ থেকে অনেক কথা শিখা যায়। মাঝে মাঝে ওদের কথা বুঝতে অসুবিধে হয়। কিন্তু মাইনেটা ঠিক বুঝতে পারে। একদিন ও রিকসা টানছে। গদীতে বসা দুই তরুণ-তরুণী। প্রেমের গল্প করছে। ও আগ্রহ ভরে শুনে। বউয়ের সাথে এমন কথা বলার সাধ ওর অনেক দিনের। কিন্তু শুনা কথা ওর কাছে বলা খুব মুস্কিল মনে হয়। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে। ও তার বউকে নিয়ে চলে গ্যাছে দূরে কোথাও----। ফের বস্তির বাঁশের গুতো খেয়ে হুশ পায়। দেখে বউ ঘুমোচ্ছে। শান্ত, কোমল। শুকনো চেহারা। হাড্ডির সাথে চামড়া লেপটে গ্যাছে। খাওন-পরন ঠিকমত দিতে পারে না। মায়া লাগে। কিন্তু কিছু করার নেই।

-'থামাও,থামাও'।

বদর রিকসা থামায়। কবি নজরুলের কবরের পাশে। ভাড়া মিটিয়ে দিলেও বদর ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওরা যেতে যেতে একেবারে কবরের উপরে গিয়ে বসে। সে অবাক হয়, মনে মনে বলে, 'দুনিয়াডার যে কি অইল। মাইনষের মরনের কথা মনে অয় না। কবরের উপরে বইস্যাও পীরিত করে।'

বদর বিড়ি ধরায়। ধুয়া ছাড়ে। আবার রিকসা টানে। বেশী জিরানের ওর অভ্যাস নাই। বউ একটা শাড়ি চেয়েছে। কিনে দিতে হবে। এ নেশাটা যেন ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সামনে বায়স্কোপের মত কেবল বউয়ের কোমল কঠিন চেহারাটা ভেসে ওঠে।

-'এই রিকসা, যাবে নাকি?'

ভদ্র উচ্চারণ মেয়েলী কণ্ঠ। উঠতি বয়স। চেহারা সুন্দর বলা যায়। 'বড়লোক মাইয়ারা সুন্দরতো

অইবই' – কথাটা মনে মনে সে বলে। একবার ভাবল যাবে। কিন্তু কি মনে করে বলে উঠল,

–'যামুনা।'

–'কেন?'

বদর রেগে যায়। কিন্তু রাস্তায় মাইয়া মানুষের সাথে রাগ চলে না। গণপিটুনির ভয় আছে। দমতেও চায় না। এমন কথাও কখনো শুনেছে বলে মনে পড়ে না।

–'আমার রিশকা, আমি যামু না। তাতে আপনের কি?' মেয়েটা এ যুক্তির কাছে হেরে যায়। বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকায়। চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। কথা বলতে গিয়েও থেমে যাওয়া যে ভাব সে অবস্থায় মেয়েদের অন্যরকম মনে হয়। বদরের এ দৃশ্য ভাল লাগে। ও দেখল মেয়েটা কোন জবাব না দিয়ে চলে গেল। যাক। এমন অনেক মেয়েকে সে ফিরিয়ে দিয়েছে।

দুপুর। রাস্তার পাথরগুলো রৌদ্রে চিক চিক করছে। সে রাস্তায় এখন রিকসার চলাচল বেশী থাকে না। মানুষজনও চলে না খুব একটা। নীরব পৃথিবী এখানে আরো নীরব লাগে। এ দৃশ্য ভাল লাগে না ঘরে একা। এখনো খায়নি। স্বামী এলে খাবে। ভাত রেঁধেছে। সাথে আলুভর্তা আর ডাল। ডালটা ভাল হয়নি। হলুদ বেশী হয়ে গ্যাছে। খুব চিন্তায় আছে। 'মানুষটা আবার রাইগ্যা ওঠে না তো!' ওর আঁচল ছিড়েছে অনেকদিন। সেলাই করাও হয়নি। দুইটাই কাপড়! তার মধ্যে একটা বিয়ের। ওটা তোলা আছে। পরা হয় না। ও খুপড়ির মধ্যে কাপড় সেলাইয়ে মনযোগী হয়ে ওঠে।

ভদ্র চেহারার কিছু মাস্তান বেশ কয়েকদিন হল ওদের বস্তির উপর চড়াও হচ্ছে। কিসের যেন ট্যাক্স দাবী করে। ভয়ে অনেকে দেয়। যারা দেয় না বা দিতে পারে না তারা মার খায়। কেউ কোন প্রতিবাদ করার সাহস পায়না। দলবল নিয়ে আসে। টাকা নিয়ে আবার দলবলসহ চলে যায়। আজ মর্জিনার খুপড়ীর কাছে মাস্তানদের সর্দারটা থেমে দাড়ায়। কি মনে করে খুপড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়ে। ভয় পেয়ে যায় মর্জিনা। আচল মাথায় তোলে। কপালে হাত দিয়ে সালাম করে হাসার চেষ্টা করে সে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে ওঠে,

–'আপনেরা–

সর্দার বলে ওঠে, 'ঐ ছেম্রী, তর জামাই কই?'

–'হেগরেনাই।'

–তোর জামাই আমাগো কাইল ট্যাকা দেয় নাই। আজকা দুপুরে দিবার কথা। কই হারামজাদা?

–'ট্যাকা থাকলেতো দিবো। আপনেরা ঘরের মধ্যে আইছেন কিইল্লেগা!'

–'চোপ মাগি। ট্যাকা নাইকা মাইনে? শালার চোখ আন্ধার কইর‍্যা দিমুনা। আবে ঐ কাসেম, দেখতো মালডা কেমুন?'

–'ওস্তাদ, আপনার চোখ কোন ছময় খারাপ অইবার পারে না। জব্বর মাল ওস্তাদ, মনে অইবার লাগছে নতুন বিয়া অইছে'

–'দরজাটালাগা!'

মর্জিনা ভয়ে চুপসে যায়। ওস্তাদের লোলুপ দৃষ্টি আরো তীব্র হয়ে ওঠে। পিশাচী দেহটার কাছে মর্জিনা নেতিয়ে পরে। চিৎকার করতে পারে না। কেবল গোঙানীর মত শব্দ করে। ছেঁড়া শাড়ি আরো ছিড়ে যায়। মর্জিনা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মাস্তানটা স্থির হয়। একসময় টলতে টলতে বেরিয়ে যায়। বস্তীর কাছে এ দৃশ্যের কোন বৈচিত্র নেই। তাই কেউ এগিয়ে আসে না। রাস্তার মানুষ আরো দূর দিয়ে হাঁটে।

বদর যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা। অনেক টাকা পেয়েছে আজ। এরকম দুদিন পেলে বউয়ের একটা কাপড় কিনতে তার কোন অসুবিধা হবে না। আজ তাকে অনেক সুখী লাগছে। কিন্তু এ সুখ টিকলনা। গরিবের সুখ টিকে না। যেমন আসে তেমন ভেসে যায়। দরজা খুলে ওর চোখ বিকৃত হয়ে যায়। মাথায় চিন্তাশক্তি লোপ পায়। শক্ত হাতে বউকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'বউ তোর এই কি অইছে? কোন শুয়োরের বাঁচ্চা তোর গতরে হাত দিছে, ক' আমারে ক বউ!'

বউ কোন কথা বলে না। নিরব হয়ে পড়ে থাকে। মর্জিনার ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি খড়কুটো আর পুরানো কাঁথার মধ্যে দিয়ে শূন্য আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

মানচিত্র

জিয়াউল হাসান নাদিম

৩য় বর্ষ, যন্ত্রকৌশল

যে ছোট্ট লঞ্চটা ভটভট শব্দ তুলে সকাল বেলায় যায় সেই লঞ্চটাই আবার বিকেলে এই পথ দিয়েই ফেরে। সোহাগপুর থামে–লোক ওঠে, লোক নামে, কালো ধোঁয়া আকাশে ওড়ে, তীরে এসে আছড়ে পড়ে ঢেউ–ছেড়ে যায় লঞ্চ। এই সোহাগপুর লঞ্চঘাটে পান–বিড়ির এক টং দোকান নিয়ে বসে আলতাফ আলী। একশলা সিগ্রেট ঠোঁটে লাগিয়ে খস করে আগুন জ্বালায়, কেউবা পান মুখে দিয়ে তারিফ করে। হিসেব করে পয়সা রাখে আলতাফ আলী। এই আলতাফ আলীকে দিয়েই এ গল্প শুরু হতে পারতো। তবে সে বড় চাপা ছেলে, বড় ভীতু ছেলে। তাকে দিয়ে শুরু করলে কাহিনীর গতি শ্লথ হয়ে পড়বার বড্ড সম্ভাবনা। আমরা বরং ভিন্ন পথে পা বাড়াই।

হযরত আলীর উঠোনে জমায়েত বসেছে– যেমনটি বসে প্রায় সন্ধ্যায়। দুনিয়ার তাবৎ সংবাদ গড়গড় করে বলে দিতে পারে হযরত আলী। আবার তাবৎ সমস্যার সমাধানও দিতে পারে এই মানুষটি। পৃথিবীটা কেন গোল করে তৈরী করা হলো তার মোক্ষম ব্যাখ্যা জানা আছে হযরত আলীর। আবার এই গোল পৃথিবীটা কবে কিভাবে খান খান হয়ে ভেঙ্গে সাগরে তলিয়ে যাবে তা–ও হযরত আলীর অজানা নয়। ষাট–উর্ধ্ব বয়সের এই লোকটির উঠোনে তাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় এরকম ছোটখাট জমায়েত বসে।

–আজকের খবরাখবর কি চাচা? হযরত আলী হয়তো প্রথমেই কথা শুরু করবেনা। হুকোর আগুনটা একটু উস্কিয়ে দিয়ে শব্দ করে লম্বা একটা টান দেবে। ধীরে ধীরে ছাড়বে ধুঁয়া,

–আসাম দ্যাশে বান ডাকছে। গাছে গাছে মানুষ। পক্ষীকুল সব দ্যাশান্তর। বেসুমার পানি আর পানি।

–এত্তো পানি আহে কইত্তন চাচা?

–পাহাড়। পাহাড় ফাইট্টা ধারা বাইর অয়।

–তাজ্জব কথা!

–খোদায় কিনা পারে! মরুভূমির মাইধ্যে আবে –জমজমের কূপ বানায়া দিছে। নূরানী চেহারার এক ফুটফুইট্টা পোলায় পা দিয়া দাপাইল আর অমনি মাটি ফাইট্টা পানি। কওতো, পোলাডা আছিল কেডা?

–পেয়ারে নবী মুস্তাফা।

–চোপ! ছাগল কোহানকার।

হযরত আলীর গালি বর্ষণ শুধুমাত্র 'ছাগল' বলেই হয়তো শেষ হতো না। কিন্তু নূরুমিয়া হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হওয়ায় হযরত চাচাকে থামতে হলো,

–ব্যাকুলের মত দৌড়াও ক্যান নূরু?

–চাচা খবর খারাপ। গঞ্জে গেছিলাম। দ্যাশে নাকি স্বাধীনের ডাক দিছে।

–খুশীর খবর নূরু মিয়া। স্বাধীন দ্যাশ। স্বাধীনভাবে চলবা। স্বাধীনভাবে কথা বলবা।

–স্বাধীন দ্যাশ কি চাচা?

–ব্যাকুল। ছাগলের ছাগল। রাম পাঠা। স্বাধীন দ্যাশ স্বাধীন মাটি। এই মাটি তোমার মাটি, এই মাটি আমার মাটি।

–মাটির মালিকতো চাচা আল্লাহ। কুরানে কইছে, হাদীসে কইছে।

হুঁকোয় ঘনঘন দু'টো টান দেয় হয়রত আলী। নাই, তামুকে যেন আগের মত তেমন ধ্বক নাই। হুঁকোর টানে মাথাটা পরিষ্কার হতে চাচ্ছেনা। কুরান হাদিসের কথাতো ফেলনা না। বিষয়ডা নিয়া ভাইবা দেখাদরকার।

সেই রাতেই আলতাফ আলীর কাছে যেতে হলো হযরত চাচাকে,

–রেডিওটা একটু চালাতো আলতাফ।

দ্যাশে স্বাধীনের ডাক দিছে। দেখি কিছু কয় কিনা।

টাংকে যত্নে তুলে রাখা রেডিওটা বের করলো আলতাফ আলী,

–শুনেন্চাচা।
–কি কয়?
–উর্দূ গান। ইচিক দানা বিচিক দানা। জব্বর গান চাচা।
–চোপ ব্যাক্কাল। প্যাটে দানা পানি নাই, ইচিক দানার গান শোনে!
–তয় বন্ধ করি চাচা।
–নাথাউক।
অনেক রাতে আলতাফ আলী এলো হযরত চাচার কাছে,
–চাচা।
–কেডা?
–আমি আলতাফ। উডেন চাচা। দরজার হুড়কো খুলে বেরিয়ে এলো হয়রত আলী,
–কিরে, এত রাইতে?
–স্বাধীনের কথা কইছে চাচা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থাইকা।
–মাটির কথা কিছু কইছে?
–স্বাধীন দ্যাশের মাটি?
–নাচাচা।
–তয় কি কইছে?
–ব্যাকতেরে যুদ্ধে যাইতে কইছে।
–হু।
–চাচা।
–যাভাগ। ঘুমাইতে দে।

নূরু মিয়া যাকে পায় তাকেই স্বাধীনের কথা শোনায়, যুদ্ধের কথা শোনায়। আলতাফ আলী নিত্য দোকান নিয়ে বসে –কানের কাছে ধরা থাকে রেডিও। কিন্তু সুবিধা হয় না। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্র সব সময় পাওয়া যায় না। হযরত আলী ছুটোছুটি করে। জনে জনে জানান দিয়ে রাখে–যুদ্ধের লাগি প্রস্তুত হও। খুশীর খবর। স্বাধীন দ্যাশ। তয় স্বাধীন দ্যাশের মাটির কথা জিগাইওনা। বিষয়ডা নিয়া আমি অখনও ভাবতাছি।

গ্রামে খবর আসতে থাকে মিলিটারীর। আশ পাশের গ্রামে হানা দিছে। গ্রাম পুড়াইতাছে। গুলিতে মানুষ মারতাছে বেসুমার। মা–বোনের ইজ্জতের উপরও হামলা করতাছে। সবতেরে সাহস দেয় হযরত চাচা –বীরের মত লড়বা, ভয়কি। স্বাধীন দ্যাশ, খুশীর খবর।

একদিন রটে গেল মিলিটারীর হামলা হবে আজ। সোহাগপুরের লোকজন সব দৌড়তে শুরু করলো। ফুলবানু দৌড়ালো, ফুলবানুর বৃদ্ধা মা দৌড়ালো। মুত্তালিব মিয়া বাতের ব্যথায় মাজা টান করতে পারেনা। তার মাজাও আজ টান হলো। নূরু মিয়ার সাত মাসের পোয়াতী বউও আজ বিছানা ছাড়লো। সবাই দৌড়াচ্ছে –উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। আলতাফ আলীর পাশে পাশে দৌড়াচ্ছে মসজিদের ইমাম
–ও আলতাফ, সবতে দৌড়ায় ক্যান?
–আপনে দৌড়ান কেন হুজুর?
–সবতের দৌড় দেইখা।
–তয় থাইমেন না। দৌড় চালায়া যান।
–ওজু যে তরক হবার উপক্রম।
–খুব জরুরী হইলে দৌড়ের উপরই ওজু নষ্ট করতে পারেন। তয় থাইমেন না।
–ইয়া আল্লাহ, তুমিই ইজ্জতের মালিক।

সেদিন মিলিটারী এলো না। অনেক রাত করে সবাই গ্রামে ফিরলো। ফুলবানু ফিরলো, নূরু মিয়া ফিরলো। আলতাফ আলী ফিরলো, হযরত চাচা ফিরলো,
–বেহদার মত সব দৌড়াইলাম কেনরে আলতাফ?
–ডরে।
–দূর ব্যাক্কল। বীরের মত মরুম। দুইডারে মাইরা মরুম।
–ডর করে চাচা।

–যা ভাগ। মুরগী কোহানকার!

এরপর একদিন সত্যি সত্যিই এলো মিলিটারী, আবার দৌড়ালো সব। যে যেদিক পারলো দৌড়ালো। দিক–বিদিক দৌড়ালো। ইমাম সাহেব সেদিন দৌড়াবার আগে বাথরুম সেরে নিতে ভুললেন না। শুধু পালালো না হযরত চাচা, পালালো না আলতাফ আলী। মোল্লা বাড়ীর গোয়াল ঘরের পিছনে খড়ের গাদার মধ্যে লুকিয়ে রইল দু'জন,

–চাচা, বাড়ী–ঘর বেবাক পুড়াইয়া সাফা কইরা দিল।

–শালা কুকুরের বাচ্চা। বেজন্মার দল।

–চাচা কি আমারে কিছু কইলেন?

–গাধা।

চুপ মেরে গেল আলতাফ আলী। ভয়ে তার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। আয়াতুল কুরছীর কয়েক আয়াত পড়ে গুলিয়ে ফেললো সে। কুড়ালের একটা ভাঙ্গা হাতল শক্ত হাতে ধরে বসে আছে হযরত আলী। মোল্লাবাড়ীর ভেতর থেকে একটা মেয়েলী চিৎকার ভেসে এলো। কঠিন হয়ে উঠলো হযরত আলীর চেহারা,

–কার গলারে আলতাফ?

–মোল্লা বাড়ীর পাগলী মাইয়া আফিয়ার গলা চাচা।

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠলো হযরত আলী,

–ইজ্জত বাঁচানো ফরজ কাম। চল, একটারে মাইরা মরুম।

–জান বাঁচানোও তো চাচা ফরজ কাম। লা–ইলাহা ইল্লা আন্তা–

চড়াৎ! আলতাফের গালে টেনে চড় কষালো হযরত চাচা,

–থুঃ।

হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে একাই ছুটলো হযরত আলী। অসহায়া আফিয়ার উপর তখন চড়াও হয়েছে এক পশু। হাতের লাঠিটা সজোরে চালালো হযরত আলী। এরই মধ্যে রাইফেলের একটা বাঁট এসে আঘাত হানলো হযরত আলীর মাথায়। চোখে আন্ধার দেখলো সে –'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ।' মাটিতে পড়ে গেল সে। এক ঝাঁক বুলেট এসে ঝাঝরা করলো তার দেহ। একবার অস্ফুট বলে উঠলো হযরত আলী, স্বাধীন দ্যাশ–স্বাধীন মাটি , নিজের মাটি।

পশ্চিমে লাল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মিলিটারীরা চলে গেছে অনেকক্ষণ। গোটা গ্রাম পুড়ে ছারখার। এখনও আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। আলতাফ আলীর তখনও ভয় কাটেনি। এক সময় গোয়াল ঘরের পিছন থেকে বেরিয়ে এলো সে। দুরে নদীর পানিতে তখনও ঝিকিমিক করছে অস্তপ্রায় সূর্যের আলো। ঘাটের দিকে হাটতে থাকে আলতাফ আলী। এলোমেলো হাটছে সে, এলোমেলো ভাবছে সে।

গোটা গ্রাম তচনচ হয়ে গেল অথচ কি শান্ত বয়ে চলেছে নদী। হাটু পানিতে নেমে এলো আলতাফ আলী। কি পরিষ্কার পানি! কি শান্ত পানি! পানিতে লাল সূর্যের আভা। পেছনে তখনও ধিকি ধিকি আগুন। চোখ ফেটে পানি এলো আলতাফের। সত্যিই বড্ড ভালবাসে সে তার গ্রামকে। নদীর পানিতে চোখ ধুলো আলতাফ আলী। পানিতে তার প্রতিবিম্ব কি পরিষ্কার! চোখ দুটো কি শান্ত!

ঘাটের ছোট্ট চায়ের দোকানের ঝাঁপি ঠেলে বেরিয়ে এলো মোকছেদ আলী। ঘাটের দোকানগুলো তখনও অক্ষত,

–আলতাফ ভাই। পলাইছিলেন কই? ঠায় দাঁড়িয়েই রইল আলতাফ! বকেই চললো মোকছেদ,

–বেঞ্চের তলায় বইয়া আল্লা খোদার নাম লইলাম। খাছ দিলে দোয়া –দরুদ পড়লাম। আল্লার কালামের বড়ই মর্তবা ! কি কন?

তখনও নিশ্চুপ আলতাফ আলী। আলতাফের ঠান্ডা দৃষ্টির পানে তাকিয়ে ভিমরী খেলো মোকছেদ। খাদে নেমে এলো গলা,

–অহন তয় কি করবেন আলতাফ ভাই?

–ঠান্ডা পানি খামু এক গেলাস।

মেকানিক্যাল ফেস্টিভেল '৯০ – সমীক্ষা

সমাজ, রাজনীতি, প্রেম, অর্থনীতি আমাদের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের মনমানসিকতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক হলেও প্রকৃতির বিস্ময়কর নিয়মেই আমাদের বেশ কিছু ক্ষেত্রে এক একজনের প্রকৃতি ভিন্নতর। আমরা ২৮টি প্রশ্ন এবং তার উত্তরের ভিত্তিতে যন্ত্রকৌশল বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের উপর সমীক্ষা চালিয়ে আমাদের গড়পড়তা ধ্যান ধারণার গাণিতিক রূপ দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি। উত্তরদাতারা যদি সঠিক ভাবনা চিন্তা করে ধীরেসুস্থে এর উত্তরগুলি দিতেন তবে এই সমীক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেত অনেকাংশে। বুয়েটের হরদম 'কুইজ', 'ক্লাশ টেস্ট' এ টিক মার্ক দিতে দিতে ছাত্র বন্ধুদের হাত এত পেকে গেছে যে এই জাতীয় সমীক্ষা পাওয়ার সাথে সাথে তা লুফে নিয়ে ঝটপট করে কাজ সেরেছেন। এরজন্য তাদেরই বা দোষ দেই কিভাবে। যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অথবা কোন সমাজ বিজ্ঞানীর কাছে এই সমীক্ষা তাঁদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে আশা রাখি।

সমীক্ষা '৯০

১/ আপনি মূলতঃ বেড়ে উঠেছেন (উত্তরদাতা–৪৩৭)
(ক) গ্রামে ৪৭٪
(খ) শহরে ২৮٪
(গ) মহানগরে ১৯٪
(ঘ) বিদেশে ৬٪

মন্তব্যঃ শিক্ষা ব্যবস্থা নগর কেন্দ্রিক হলেও অর্ধেক ছেলেমেয়ে আসে গ্রাম থেকে, তাই ৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে দেশবাঁচবে।

২/ আপনি লেখা–পড়া করেছেন (উত্তরদাতা–৩৭৫)
(ক) লেখা–পড়ার প্রতি আগ্রহের কারণে ১২٪
(খ) অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য ১৫٪
(গ) সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ৬৩٪
(ঘ) অন্য কোন কারণে, ১০٪

মন্তব্যঃ 'লেখা–পড়ার আগ্রহের কারণে লেখাপড়া করা' এই শাশ্বত রীতি ছাত্রদের মধ্যে নেই। এখন সবাই গাড়ী, বাড়ী, নারীর প্রতি আকৃষ্ট।

৩/ কোন ধরনের পেশায় নিজকে নিয়োজিত করার স্বপ্ন ছিল আপনার।
(উত্তর দাতা–৪৫০)
(ক) প্রকৌশলী ৬৩٪
(খ) ডাক্তার ৩٪
(গ) আমলা ১০٪
(ঘ) সামরিক অফিসার ৫٪
(ঙ) অন্য কিছু ১৮٪

মন্তব্যঃ লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি অনেকের জীবনে।

৪/ আপনি প্রবাসে যেতে চান(উত্তরদাতা–৩৯০)
(ক) উচ্চ শিক্ষার জন্য ৩৯٪
(খ) স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ১৩٪
(গ) অস্থায়ীভাবে চাকুরী করে গাড়ী, বাড়ী, ব্যাংক ব্যালেন্স করার জন্য ৪৮٪

মন্তব্যঃ উচ্চ শিক্ষা এবং গাড়ী–বাড়ীর জন্য যেতে চাইলেও খুব কমই বিদেশে স্থায়ীভাবে থাকতে চায়। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় -----,

৫/ আপনাকে যদি দেশে গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয় তবে বিদেশে যাবেন কি?
(উত্তরদাতা–৪০০)
(ক) হ্যাঁ ৫১٪
(খ) না ৪৯٪

মন্তব্যঃ দ্যাশে সুযোগ দিলেও বিদ্যাশে যাইবার চানকে?

৬/ প্রতিটি ক্লাশের পর পাঁচ মিনিট বিরতি শিক্ষা গ্রহণে অধিকতর সহায়ক হতে পারে কি?
(উত্তর দাতা–৪৩০)
(ক) হ্যাঁ ৮৩٪
(খ) না ১৭٪

মন্তব্যঃ Kবশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ক' নং উত্তরটির প্রতি

এতো দ্যামাগ দেহান ভাল না।

৭/ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ করতে এসে গেট আটকানো দেখলে আপনার খুশি হওয়ার কারণ (উত্তরদাতা–৪০৫)
(ক) ক্লাশ করতে ভাল লাগে না ৫৮٪
(খ) ক্যাফেতে আড্ডা দেয়া+তাশ খেলা যাবে ৯٪
(গ) খুশি হওয়ার কারণ নেই ৩৩٪

মন্তব্যঃ যদিও অনেকেই ক্লাশ করতে এসে গেট আটকানো দেখলে খুশি হননা তদুপরি বেশীর ভাগেরই ক্লাশ করতে ভাল লাগে না, এরজন্য একটানা একঘেঁয়েমী ক্লাসের অবসান ঘটালে সুফল আসতে পারে।

৯/ সামগ্রিক শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দরকার–(উত্তরদাতা–৪০১)
(ক) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ২০٪
(খ) আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নতি ২৬٪
(গ) শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়ানো ১২٪
(ঘ) সচেতনতা ৪২٪

মন্তব্যঃ গুটি কয়েক জাতীয় নেতার কলকাঠি হয়ে থাকলে ছাত্রদের সচেতনতা আসবে কোথা থেকে?

১১/ ছাত্র রাজনীতিতে (উত্তরদাতা–৪০২)
(ক) সক্রিয়ভাবে জড়িত ২২٪
(খ) সচেতন, তবে সক্রিয় নন ৬২٪
(গ) আদৌ ভাবেন না ১৬٪

মন্তব্যঃ আদৌ না ভাবিলে শৃগাল মশাই মুরগীর ছানা খাইয়া ফেলিবে টের পাইবেন না।

১৩/ গৃহ শিক্ষকতাকে ভাল রেজাল্টের পথে অন্তরায় বলে মনে হয় (উত্তরদাতা–২৮৫)
(ক) হ্যাঁ ৩৮٪
(খ) না ৬২٪

মন্তব্যঃ নানার জন্য দিনে ক্লাশবন্ধ এবং গেট আটকানোর জন্য মাষ্টারি করার সুফল পেয়ে গেলেন। নতুবা ঠিকই 'হ্যাঁ' টিক দিতেন একশভাগ।

১৫/ প্রেম করলেই বিয়ে করতে হবে কি? (উত্তরদাতা–৪০০)
(ক) হ্যাঁ ৪০٪
(খ) না ৬০٪

মন্তব্যঃ বাঙালীর শাশ্বত রক্ষণশীল মনোভাব নেই। আর থাকবেই বা কেন যে হারে পাশ্চাত্য ভিডিও, অডিওআসছে----।

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৮/ পত্রিকা বা ম্যাগাজিন পড়েন (উত্তরদাতা–৪০২)
(ক) প্রধানতঃ বাংলা ৪০٪
(খ) প্রধানতঃ ইংরেজী ৫٪
(গ) দুটোই ৪২٪
(ঘ) দৈবাৎ পড়েন ১৩٪

মন্তব্যঃ যারা দৈবাৎ পড়েন তাদেরকে বলছি 'সামাজিক জীব হউন এবং সঠিক অভ্যাসটি এখন থেকেই শুরু করুন।

১০/ আপনার সখ –(উত্তর দাতা–৩৫০)
(ক) খেলাধুলা ২৪٪
(খ) বই পড়া ৫৩٪
(গ) গান গাওয়া বা শুনা ২২٪
(ঘ) ফিলাটেলী ১٪

মন্তব্যঃ সব সখই কম বেশী আছে তবে গান গাওয়ার সখটা বোধ হয় বাথরুম ছাড়া অন্য জায়গায় নেই।

১২/ গৃহ শিক্ষকতায় জড়িত (উত্তরদাতা–৩৯৫)
(ক) অনিয়মিত ৩৬٪
(খ) নিয়মিত ১৮٪
(গ) কখনও না ৪৬٪

মন্তব্যঃ অর্থাৎ অর্ধেকের বেশীই গৃহ শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ।

আপনি কি প্রেম করেন? (উত্তর দাতা– ৩৮৫)
(ক) হ্যাঁ ৪৮٪
(খ)না৫২٪

মন্তব্যঃ বুয়েটে কিছু বাড়তি মেয়ে আসাতে, তাছাড়া পাশে রোকেয়া, শামসুন্নাহার থাকাতে বেশ মজাতেই আছেন।

১৬/ আপনি কি হলে থাকেন? (উত্তরদাতা–৩৯০)
(ক) নিয়মিত – ৭৬٪
(খ) অনিয়মিত–১৪٪
(গ) কখনই না–১০٪

মন্তব্যঃ আটটি হল বাঁচলে বুয়েট বাঁচবে।

১৭/ মডেল ল্যাবে সেশনাল বেশী ভয় লাগে কারণ (উত্তরদাতা–৩৭৫)
(ক) অন্যান্য সেশনাল থেকে কঠিন ২২%
(খ) স্যাররা আগে লেকচার দেন না ৩৪%
(গ) ল্যাবে এইসব মডেল নেই ৪৪%

মন্তব্যঃ ল্যাবে বিভিন্ন যন্ত্রের মডেল বৃদ্ধির সাথে সাথে পূর্বে লেকচার দিলে এই মডেল ল্যাব ভীতিটা কিছুটা কমবে।

১৮/ বুয়েটের চিকিৎসা ব্যবস্থা– (উত্তরদাতা–৪০৬)
(ক) সন্তোষজনক ৮%
(খ) নিম্নমানের ৪৯%
(গ) মোটামুটি ৪৩%

মন্তব্যঃ যারা সন্তোষজনক বলেছেন তারা সম্ভবতঃ কখনও বুয়েটের মেডিক্যাল সেন্টারে যাননি। তবে চিকিৎসা ব্যবস্থা যে নিম্নমানের এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৯/ রাষ্ট্রীয়ত্ব শাসন ব্যবস্থায় যে নীতিতে বিশ্বাসী –(মোটউত্তরদাতা–৩৫৭)
(ক) সামরিক শাসন ৫%
(খ) ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ১৮%
(গ) সমাজতন্ত্র ১৪%
(ঘ) গণতন্ত্র ৬৩%

মন্তব্যঃ গণতন্ত্র এগিয়ে অতঃপর ইসলামী শাসন– তৃতীয়–সমাজতন্ত্র। সামরিক শাসনের পক্ষেও আছে!

২০/ সামাজিক ভাবে আপনি নিজেকে কি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান– (উত্তরদাতা–৩৮১)
(ক) শিক্ষক ৭%
(খ) প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২১%
(গ) পুরোপুরি কারিগরী কর্মকান্ডে ৫৭%
(ঘ) ব্যবসায়ী ১৫%

মন্তব্যঃ প্রকৌশলী হয়ে বের হলেও পুরোপুরি কারিগরী কর্মকান্ডে কেউ যাবেনা। হয়ত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অসারতাই প্রমাণ করে এটা।

২১/ যন্ত্রকৌশল বিভাগের শিক্ষকরা অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক থেকে– (উত্তরদাতা–৪০০)
(ক) বেশী নিয়ম মেনে চলেন ৭৪%
(খ) কম নিয়ম মেনে চলেন ৪%
(গ) নিয়ম মানেন না ২২%

মন্তব্যঃ Discipline is the key to success: কিন্তু লেবু অধিক চিপলে –

২২/ যন্ত্রকৌশল বিভাগের ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক (উত্তরদাতা – ৩০৫)
(ক) ভাল ৭%
(খ) খারাপ ৫৫%
(গ) মোটামুটি ৩৮%

মন্তব্যঃ স্যারেরা এত নিয়ম মেনে চলেন তবুও ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক খারাপ। তবে কি এত নিয়ম শৃংখলই –না থাক্ বলব না –'সহজ কথা যায়না বলা সহজে।'

(শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য)

২৩/ স্ত্রী নির্বাচনে কোন বিষয়টিকে প্রাধান্য দেবেন– (উত্তরদাতা–৩৭০)
(ক) চেহারা ৪৯%
(খ) শিক্ষা ২৬%
(গ) ধর্মপরায়নতা ১৬%
(ঘ) শ্বশুরের প্রতিপত্তি ৯%

২৪/ আপনি কি ধরণের স্ত্রী পছন্দ করেন– (উত্তরদাতা – ২৯০)
(ক) প্রকৌশলী ৪%
(খ) ডাক্তার ১০%
(গ) শিক্ষক ৩২%
(ঘ) গৃহিনী ৫৪%

মন্তব্যঃ চেহারার পক্ষপাতি সবাই নন। ধর্মপরায়নতা এবং শিক্ষাও উল্লেখযোগ্য নির্ণায়ক।

মন্তব্যঃ 'সংসার সুখের হয় গৃহিনীর গুণে–

(শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য)

২৫/ স্বামী হিসাবে আপনার পছন্দ (উত্তরদাতা–১৪জন)
(ক) প্রকৌশলী ১০০%
(খ) ডাক্তার
(গ) আমলা
(ঘ) শিক্ষক
(ঙ)ব্যবসায়ী

২৬/ স্বামীর কোন বিষয়টিকে আপনি প্রাধান্য দিবেন– (উত্তরদাতা – ১৪ জন)
(ক) ব্যক্তিত্ব ৭৮%
(খ) শিক্ষা
(গ) অর্থ ১২%
(ঘ) চেহারা

মন্তব্যঃ আপনারা ১০০ ভাগই প্রকৌশলী চান কিন্তু আপনাদের দুঃখ খুব কম প্রকৌশলীই (৪%)

মন্তব্যঃ এই আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রকৃত ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, তবে আপনাদের ধন্যবাদ

আপনাদেরচায়।

খুব কম জনই অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(শুধুমাত্র সমাপনী বর্ষের ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য)

২৭/ আপনার বৈবাহিক অবস্থান কোথায়
(উত্তরদাতা–৮০)

(ক) বিবাহিত ১৯٪
(খ) দ্বারপ্রান্তে ২১٪
(গ) আরো অন্ত ত;তিন বছর পর ২০٪
(ঘ) আরো অন্ততঃ পাঁচ বছর পর–৪০٪

মন্তব্যঃ আমাদের সাথে এত জন বিবাহিত ছিল তা তো আগে জানতাম না!

২৮/ এই মুহূর্তে আপনার শৈশব স্বপ্ন ও জীবনের সত্যিকার প্রাপ্তির কোন সংগতি খুঁজে পাচ্ছেন কি?
(উত্তরদাতা – ৮২)
(ক) হ্যাঁ ১৭٪
(খ) কিছুটা ৩৫٪
(গ) মোটেই না ৪৮٪

মন্তব্যঃ আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল --

পরিসংখ্যানঃ মোঃ আতিকুর রহমান রানা/সমাপনী বর্ষ
মন্তব্যঃ মোঃ ফররুখ শিয়ার পুলক /সমাপনী বর্ষ

LIST OF HEADS

DEPT. OF MECHANICAL ENGG., BUET.

1.	PROF. A. M. Ahmed	-	1950-17.08.64
2.	PROF. R. U. AHMED	-	18.08.64-08.02.65
3.	PROF. V. G. DESA	-	09.02.65-14.12.70
4.	PROF. M. H. KHAN	-	15.12.70-29.09.76
5.	PROF. O. ISLAM	-	30.09.76-15.07.77
6.	PROF. M. H. KHAN	-	16.07.77-27.07.81
7.	PROF M. A. HOSSAIN	-	28.07.81-31.07.83
8.	PROF. A. M. A. HUQ.	-	01. 08.83-31.07.85
9.	PROF. M. A. T. ALI	-	01.08.85-31.07.87
10.	PROF. D. K. DAS	-	01.08.87-04.08.89
11.	PROF. S. M. N. ISLAM	-	5.08.89-

আমাদের প্রিয় সেলিম স্যারের
বিদায় সম্বর্ধনা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় যন্ত্রকৌশল বিভাগের শিক্ষক জনাব মাসুদ আহমেদ সেলিম কমনওয়েলথ বৃত্তি পেয়ে সম্প্রতি ইংল্যান্ডের ইমপেরিয়াল কলেজ অব সাইন্স, টেকনলজি এন্ড মেডিসিন-এ পি, এইচ, ডি করার উদ্দেশ্যে ২৮৯৯০ তারিখে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন। উনি সেখানে তিন বৎসরের কোর্স সমাপ্ত করে দেশে ফিরবেন। জনাব মাসুদ আহমেদ সেলিম ১৯৭৭সালে নাজনীন হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং ১৯৭৯ সালে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৮৪ সালে বুয়েটে কৃতিত্বের সাথে যন্ত্রকৌশলে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে গোল্ড মেডেল লাভ করেন। উল্লেখ্য তিনি চার বর্ষেই প্রথম হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। যন্ত্রকৌশলের ১ম বর্ষের ছাত্ররা এ উপলক্ষ্যে তাঁর জন্য বর্ণাঢ্য বিদায় অনুষ্ঠান এর আয়োজন করে। আমরা আমাদের এই প্রিয় স্যারটির সফলতা কামনা করি।

ডঃ এম এ তাহের আলীর কৃতিত্ব

১৯৭৯ সালে ময়মনসিংহের পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট একটি ৬ হাজার কিউরী ক্ষমতা সম্পন্ন কোবাল্ট ৬০ গামা বিকিরণ যন্ত্র স্থাপন করে। সোর্সটি চালানোর পর থেকেই এতে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। '৮৫ সালের জুনে এটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত অবস্থায় আটকে যায় এবং জরুরী কেবলের সাহায্যে নামানোর চেষ্টাকালে কেবলটি ছিড়ে যায়। ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার আশংকায় আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আই,এ,ই,এ) কাছে সোর্সটি উদ্ধারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। বিদেশীরা বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলে দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে সোর্সটির উদ্ধারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রফেসর ডঃ এম, এ, তাহের আলীকে চেয়ারম্যান করে ৬ সদস্যের একটি উপকমিটি এই সোর্স উদ্ধারে সক্ষম হয়। এরজন্য ব্যবহৃত সমস্ত যন্ত্রপাতি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেশিন শপে তৈরী করা হয়। আমরা আমাদের এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি এবং দেশীয় প্রযুক্তিবিদদের উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহিত করার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানাই।

যন্ত্রকৌশলে যেমন আছি

কারণে অকারণে ছুটে যাই বিভাগীয় অফিসে।

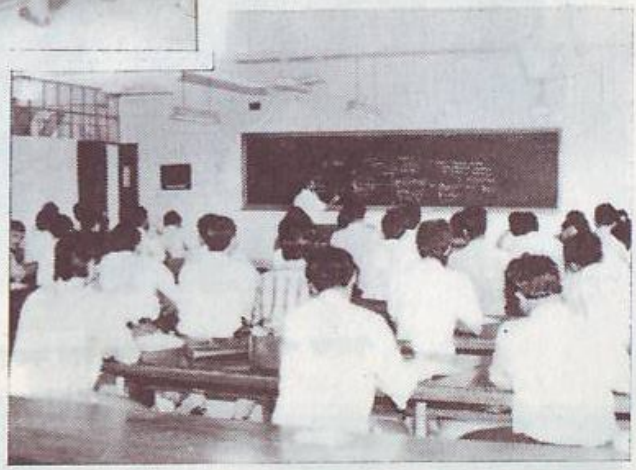

ক্লাস লেকচার বিষাদ লাগলেও স্যারের প্রতি মনোযোগ একশ ভাগ।

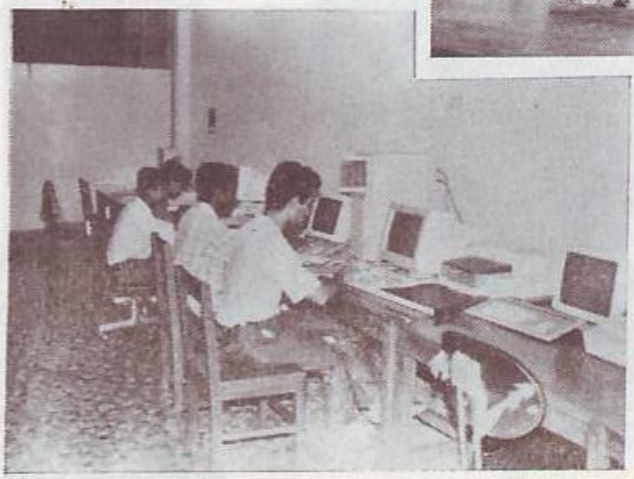

কম্পিউটার রুম

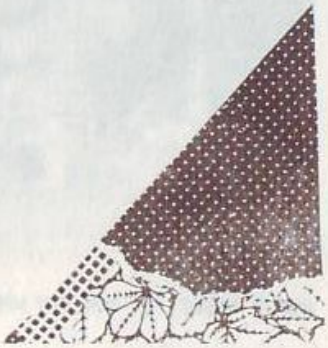

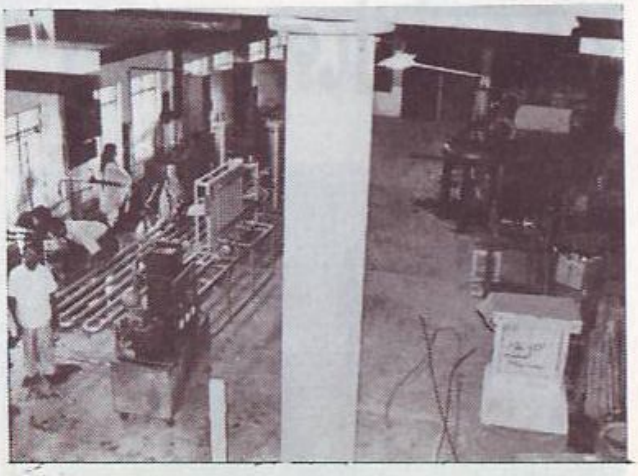

ফুয়িড ল্যাব

ল্যাবের শংকরদার সাথে কাজ করে সবাই আনন্দ পায়।

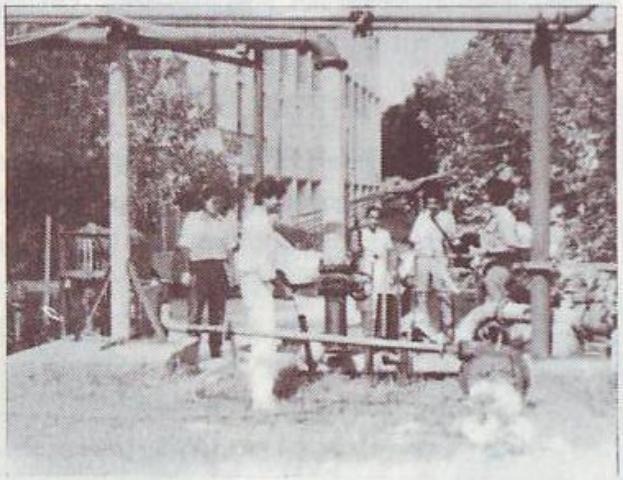

প্রজেক্টে আড্ডা এবং কাজ চলে একই তালে।

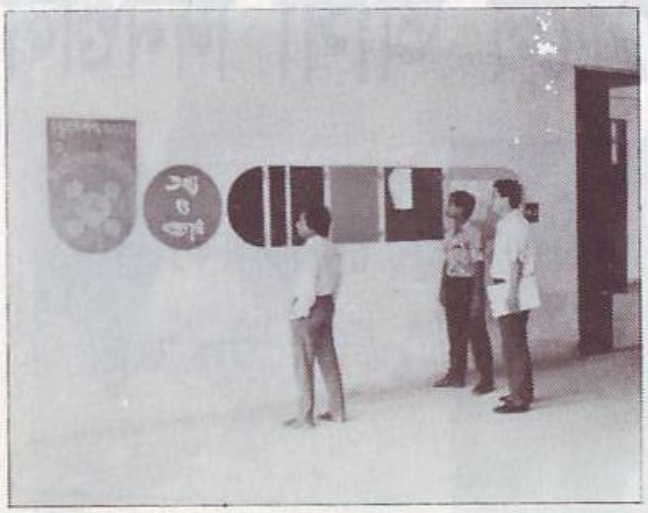

সংসদের চার রঙের বোর্ডে প্রচারিত 'তথ্য' ছাত্ররা দেখে আগ্রহের সাথে।

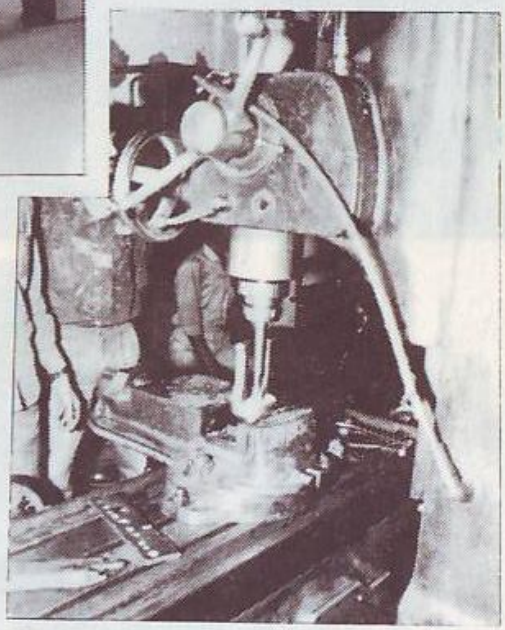

যন্ত্র এবং যন্ত্রণা

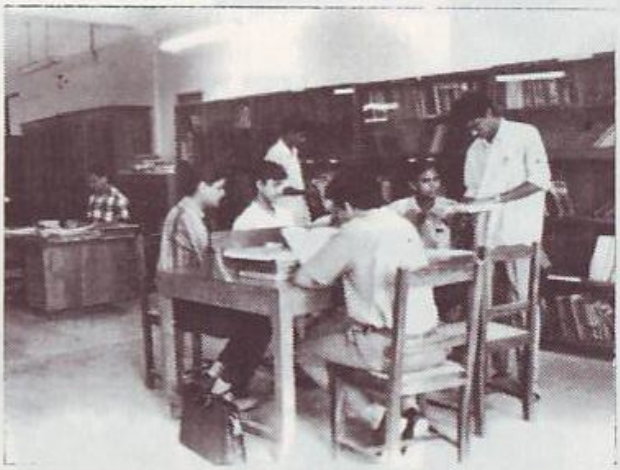

আমাদের বিভাগীয় লাইব্রেরী; পড়ালেখা না কি..।

ফেলে আসা দিনগুলি

মেকানিক্যাল ফেস্টিভেল '৮৬

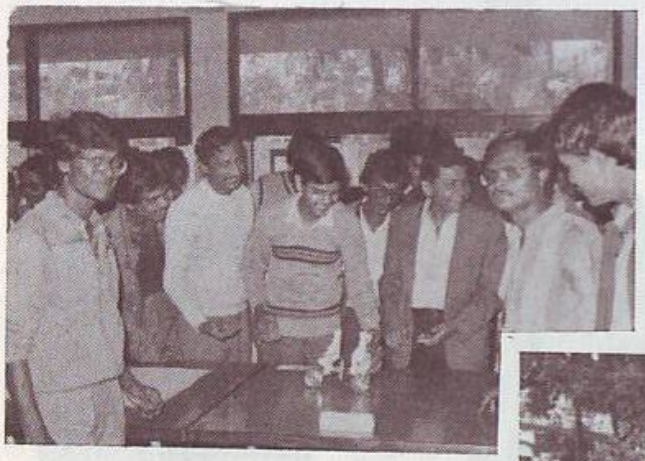

• '৮৬-র অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিউষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ফজলে হোসেন।

• বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রী

• প্রদর্শনীতে বিশেষ অতিথি ফজলে হোসেন।

• প্রীতি ভলিবল

মেকানিক্যাল ফেস্টিভেল '৮৭

• '৮৭তে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থার তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী নেফাউর রহমান।

• '৮৭-র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

• '৮৭-র প্রদর্শনী দেখছেন তামিম স্যার

মেকানিক্যাল ফেস্টিভেল '৮৯

• '৮৯ এর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিচ্ছেন পিডিবি-র চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ শামসুল ইসলাম

• বিদায়ী ছাত্ররা স্যারদের সাথে করমর্দন করছেন।